আহ্ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

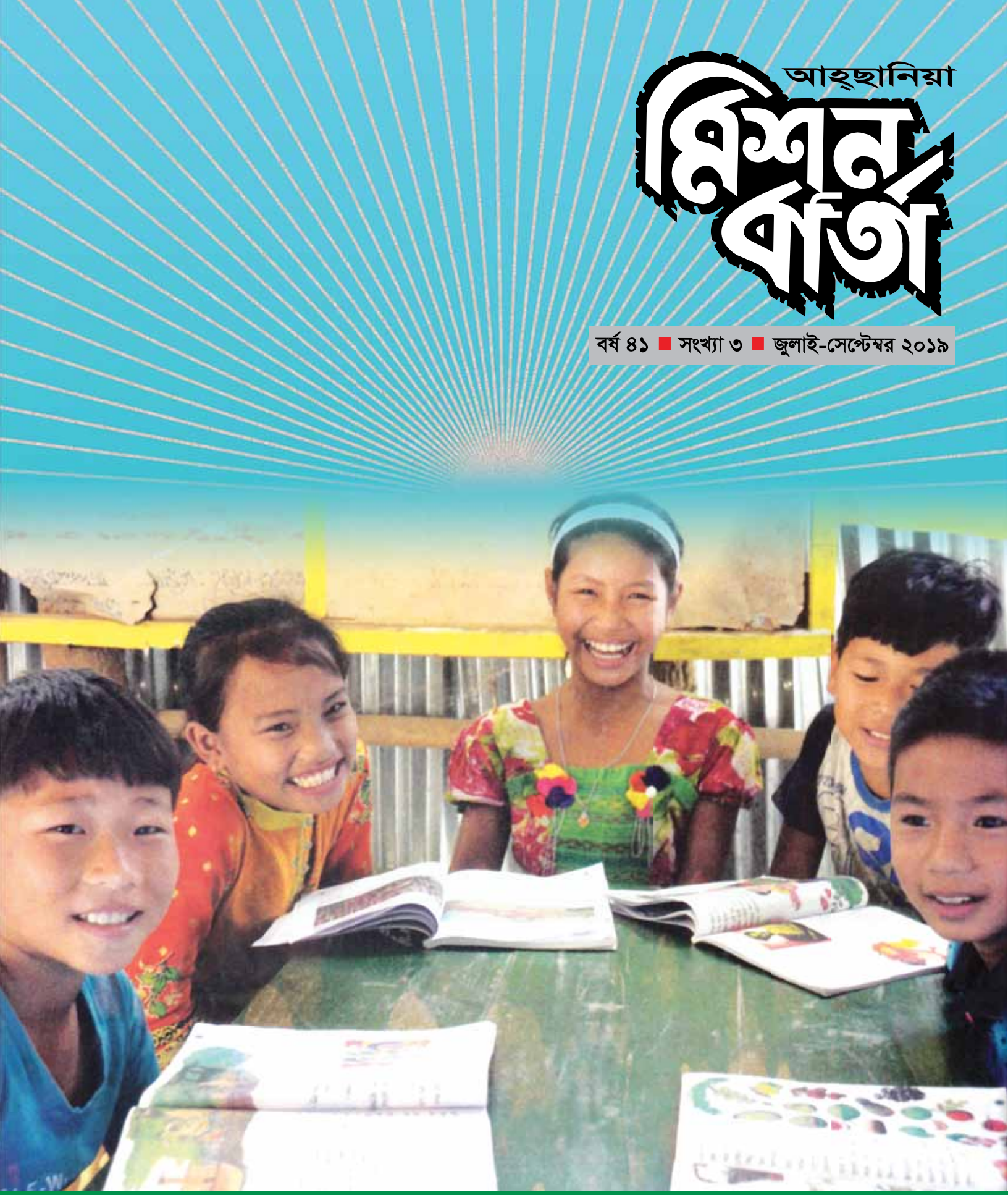

প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ❑ সংখ্যা ৩ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'বহু ভাষায় সাক্ষরতা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা'। আমরাও বলি এই প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী এবং অর্থবহ। দেশের সকল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষার সাথে সাথে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় সাক্ষরতা উপকরণ প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন ছিলো এদেশটিকে সোনার বাংলায় পরিণত করা। আর এজন্য সকলকে সাক্ষরতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই জনগনকে সাক্ষর করে তোলার চেষ্টা চলছে বহু বছর ধরে। আশা ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। সেটা এখনও সম্ভব হয়নি। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে যে একটি দেশে প্রচলিত সকল ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যার যে ভাষা তাকে সেই ভাষাতেই সাক্ষর করে তোলার উদ্যোগ না নিলে পুরো জাতিকে সাক্ষর করে তোলার কর্মসূচি সফল হবে না।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্যের প্রেক্ষিতে বলতে হয় সাক্ষর জাতি তৈরির লক্ষ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জরুরি। বাংলাদেশে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত শুরু থেকেই।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় পারদর্শী নয়, তারা অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। মাতৃভাষায় শিখন শিক্ষা বাস্তবায়ন করা না গেলে স্বাভাবিক ভাবেই সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। যে কারণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) কার্যক্রমে মাতৃভাষা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাতৃ ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাম নানামুখী ও সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা উপকরণমালা তৈরি, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ফ্লাশকার্ড, চার্ট, বিভিন্ন ভাষায় ছড়া ও গল্পের বই, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

এবার প্রচ্ছদ কাহিনীর পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক একাধিক রচনা প্রকাশ করা হল। এসব লেখায় বিষয়টি সামগ্রীকভাবে দেখা হয়েছে। পাঠক এ থেকে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। পাশাপাশি মিশনের কার্যক্রমের একটা সাম্প্রতিক চিত্র স্পষ্ট হবে। যেমন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র শিক্ষা দর্শন, শিক্ষায় নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, এবং কয়েকটি প্রকল্পের কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন। মিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সংবাদও প্রকাশিত হল।

নিয়মিত বিভাগগুলো যথারীতি প্রকাশ করা হল।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৬-৯

এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্যের প্রেক্ষিতে বলতে হয় সাক্ষর জাতি তৈরির লক্ষ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জরুরি। আর প্রাক-শিখনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন	৩-৫
নিবন্ধ	১০-১১
বিশেষ প্রতিবেদন	১২-১৩
প্রতিবেদন	১৪-১৫
ফিচার	১৬-১৭
শিক্ষা	২৫-৩০
স্বাস্থ্য	৩১
জীবন-জীবিকা	৩২

৩

প্রতিষ্ঠার দর্শন নিয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র শিক্ষা দর্শন' লিখেছেন মো. সাহিদুল ইসলাম

১০

শিক্ষায় নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক নিবন্ধটি লিখেছেন কাজী আলী রেজা

১২

সম্প্রতি সিনেড, কমনওয়েলথ অব লার্নিং-এর আর্থিক সহায়তায় একটি জরিপের কাজ শেষ করেছে। জরিপের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন শাহনেওয়াজ খান

১৪

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়ে জীবনব্যাপী শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা নিয়ে লিখেছেন নাফিজ উদ্দিন খান

২১

মিশন দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও মানোন্নয়নের বেশ কিছু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে লিখেছেন মো. দেলোয়ার হোসেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর শিক্ষা দর্শন

মো. সাহিদুল ইসলাম ॥ মো. হাবিবুর রহমান ॥ প্রশান্ত ডেভিড সাধু খাঁ

ভূমিকা : "মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক- এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টিসাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য হয়। উদ্ভিদ বীজ যেমন- বায়ু, জল ও সূর্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুরাও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিসেবে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর নাম সর্বজন বিদিত। দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল সংস্কার সাধন করে গেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা চিন্তা ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে তাঁর দেয়া পরামর্শ; Calcutta University Commission Report 1917-1919 "টিচার্স ম্যানুয়েল" ও "শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান" গ্রন্থদ্বয় এবং কিছু প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দর্শন সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বিস্তারিত বিষয় থেকে শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ কয়েকটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠন: শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষাভাবনা ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং সেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি মনে করতেন, সমাজে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে অবারিত। এই সমাজে একজন মানুষ হবে বিচক্ষণ, বিবেকবুদ্ধিচালিত এবং গঠিত হবে তার নৈতিক চরিত্র। সাধারণ নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সাধারণের ধারণায় থাকবে প্রেম, ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শ। তাঁর মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- 'মনুষ্যত্ব লাভ'। আর মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক– এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মায় প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা পদবাচ্য হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধি জন্মানো, আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়ী একজন মানুষ করে গড়ে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন– 'জ্ঞান লিপ্সাকে বর্ধিত করিয়া মানসিক শক্তিকে পরিচালনা করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)।

তাঁর মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- 'মনুষ্যত্ব লাভ'। আর মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক– এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মায় প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা।

শিক্ষার বিষয় বস্তু: সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন– ভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অভিন্ন অভিমত। প্রতিটি বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদানপদ্ধতি সবই লক্ষ্যমুখী করণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সমাজের একজন মানুষকে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করণ সম্পর্কে হজরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অত্যন্ত বাস্তবতাবাদী মতাদর্শের অধিকারী ছিলেন। ইতিহাস পাঠকে শুধু অতীত অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে না দেখে একে কার্যকর চেতনাদাত্রী হিসেবে ভাবা আবশ্যক মনে করতেন তিনি। তিনি তাঁর 'ইসলামের ইতিবৃত্ত' বইয়ের স্কুল সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন– "ইসলামের ইতিবৃত্ত কতকগুলি ঘটনা বা সন তারিখের তালিকা নহে। ইসলামের ইতিবৃত্ত মানবজাতির মুক্তি সাধনার ইতিবৃত্ত। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তের মধ্যে তাহার জাতীয় জীবন, শিক্ষা-সভ্যতা, সুখ-দুঃখ ও গৌরবের প্রকৃত পরিচয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই নিহিত। সুতরাং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নকালে এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: --)। তিনি এটাও বলেছেন– "যদি একটি দেশে কোনো একটি রোগের প্রভাব বেশি দেখা যায়, তবে সে রোগের ধারণা ও প্রতিরোধের উপায়ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: --)।

শিক্ষাস্থল: একটি মানবশিশু জন্মের পর সে সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য শরীর, মন ও আত্মা– এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষার জন্য শিক্ষাস্থল হবে মূলত ১.গৃহ, ২.বিদ্যালয়, ৩.ধর্মশালা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'গৃহ হলো শিক্ষার ভিত্তিস্থান। কেবল গৃহে শিক্ষার পরিপক্কতা জন্মিতে পারে না বলিয়াই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা, একটি অপরটির পরিপূরক।' 'গৃহ-শিক্ষার উপর চরিত্র-গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে। মাতা-পিতার প্রভাবে পুত্র-কন্যার চরিত্র যেরূপ সহজে গঠিত হয়, অপরের প্রভাবে তদ্রূপ হয় না।' (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: --)। গৃহ থেকেই মানুষের মূল্যবোধ তৈরি হয়। যার আলোকে গড়ে ওঠে বিবেক; গড়ে উঠে তার চেতনা; গড়ে ওঠে তার শক্তি। একজন মানুষের মানবীয় সত্তার বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে বহুমুখী, যাতে ব্যক্তিসত্ত্বার বহুমুখী বিকাশের সহায়ক হয়। বিদ্যালয় হবে মানুষ তৈরির কারখানা। মানুষ তৈরির জন্য সব আয়োজনের সমন্বয় ঘটবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষাব্যবস্থার একই ধারা : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বহুবিধ শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে একই ধারা আনতে পারলে দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন

শিক্ষা দর্শন শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপ স্থাপন করেন মিশনের হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, মো. সাহিদুল ইসলাম

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষার ধারা প্রসঙ্গে বলেছেন- "একই সাথে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলে সমগ্রতা ও একাগ্রতা অনুধাবনে অসুবিধা হয়। উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থাকে একই ধারায় আনয়ন"। (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। তিনি মাদ্রাসা এবং স্কুল এই দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় করে একটি ধারা প্রবর্তনের কথা লিখেছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন : 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিশন প্রতিষ্ঠাতা শাহ সুফী হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি শিক্ষা কর্মসূচিকে প্রাথ মিক সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য ঢাকার তেজগাঁওয়ে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ২য় দশকে সরকারি সহায়তায় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এভাবে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকে। তিনি মনে করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে আদর্শ নকশা অনুযায়ী। শিক্ষা উপযোগী আসবাবপত্র ও উপকরণাদির সুব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও বিকাশের জন্য থাকবে সংগঠিত লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম। ছাত্রনিবাস চলবে সুনির্দিষ্ট নিয়মে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটাবে। পৃথিবীতে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে 'মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব, পরীক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলা নয়।'

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মতে, "শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের ক্রিয়াশীলতা জন্মায়, মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়, যাতে জ্ঞান অন্বেষণ ও সুপ্ত শক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে, প্রত্যেকের আত্মবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়"। তিনি মনে করতেন, "পরীক্ষায় কৃতকার্যতা কোনো শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। প্রকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা শিক্ষা দিলে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ের পূর্ণতা লাভ হইতে পারে।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা চেতনা সন্নিবেশিত হয়েছে তার 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান' প্রবন্ধ পুস্তকে (১৯১৮) এবং 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থে (১৯১৫)।

তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণ : শিক্ষাকে সহজ ও আধুনিক করার জন্য শিক্ষানীতি, সহজ পাঠদান পদ্ধতি এবং পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত আর সহজ পদ্ধতির শিক্ষাদানের জন্য ১৯১৫ সালে তিনি টিচারস্ ম্যানুয়েল রচনা করেন। ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, সাহিত্য, পাটিগণিত শিক্ষা, ভূগোল শিক্ষা, ইতিহাস, জ্যামিতি, কিন্ডারগার্টেন, বস্তু পাঠ, প্রকৃতি ও বিজ্ঞান, ড্রিল, ড্রইং ও হাতের কাজ, ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ছাত্রদের চরিত্র, শিক্ষাদানের সাধারণ সূত্র, ইংরেজি শিক্ষার প্রণালি, নীতি ও ধর্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, পরিশিষ্ট এবং সর্বোপরি স্কুল গৃহনির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ধর্ম শিক্ষার ওপর গুরুত্ব : তিনি ধর্মকে শিক্ষার ভিত হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন। তাঁর মতে– শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মালোচনা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাত্রদের মনেপ্রাণে খোদার প্রতি এবং সমগ্র মানবতার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে। একজন মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভের জন্য নৈতিক চরিত্র গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে এই নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক স্কুলে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি নামাজ থাকবে ব্যধ্যতামূলক। খোদাবিহীন শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা পাশাপাশি চলবে। তিনি লিখেছেন– 'সমগ্র মানব সমাজে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মহান দায়িত্ব নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত।' (--- --- ---,

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। মিশন প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের আদর্শ প্রচার ও প্রসার হচ্ছে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের মাধ্যমে।

নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন : নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মনে করতেন, চরিত্রই মানবের সর্বপ্রধান সম্পদ। একজন মানবের জন্য প্রয়োজন নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র গঠন। তার জন্য শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার। তাই প্রয়োজন নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানবের চরিত্র গঠন করা। পাশাপাশি থাকবে বাস্তব জীবনের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি তত্ত্বগত শিক্ষার ব্যবস্থা। একই সঙ্গে অর্জিত হবে ন্যায়ানুষ্ঠানের অভ্যাস। তিনি লিখেছেন– 'বালক-বালিকার হৃদয়েই সু ও কু-র বীজ নিহিত থাকে। গুরুজন যত্নপূর্বক সুপ্রবৃত্তিগুলির আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিগুলির অনাচরণ দ্বারা একের পুষ্টি ও উৎকর্ষ এবং অপরের দমন সাধন করিবেন। ইহা এক দিনের কার্য নহে। ইহা বড় কঠিন যোগ।' ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ্যসূচির মধ্যে জীবন গঠনমূলক নীতি ও উপদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে এই শিক্ষা বাস্তবায়ন 'শিক্ষকের যোগ্যতা, তাহার ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।' 'মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে আগত, পরমাত্মার সহিত পুনঃমিলনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।' অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ চরিত্র গঠন। আর এই চরিত্র গঠনের জন্য নীতিশিক্ষা অপরিহার্য। তাই ধর্ম নির্বিশেষে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক করা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'মানব প্রেম– সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে সৃষ্টের প্রতি ভালোবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস আসিলে পাপের ভীতি ও পুণ্যের আকর্ষণ জন্মে। উহার ফলে ধর্মের অনুরাগ ও চরিত্র গঠিত হয়। শিক্ষক ধর্মপরায়ণ হইলে তাহার প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সুফলপ্রসূ হয়।' (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে বিলটি প্রচণ্ড বিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বিরোধ মেটাতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে সমতার ফলাফল পেতে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার রীতি চালু করতে সক্ষম হন।

শিক্ষা সংস্কারক : শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে গেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে বিলটি প্রচণ্ড বিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বিরোধ মেটাতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে সমতার ফলাফল পেতে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার রীতি চালু করতে সক্ষম হন। সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন– ভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অভিন্ন অভিমত। প্রতিটি বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদান পদ্ধতি সবই লক্ষ্যমুখীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

নারী শিক্ষা : পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। পুরুষের শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নারী শিক্ষার প্রতিও তদ্রুপ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষা নারীদের সুগৃহিনী হিসেবে গড়ে তুলবে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য' গ্রন্থে বলেছেন "খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানব-জাতির অর্ধাংশ অন্তপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, সওদাপত্র করিতে হইবে, শিক্ষয়িত্রীর কার্যকরিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগে অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। "স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয় যে, স্বামীর প্রভূত্বের বেড়ী অতিক্রম করিবে, কিংবা নিজেকে অপর পুরুষ দ্বারা প্রলুব্ধ হইবার সুযোগ দিবে"। (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)। তিনি আরও উল্লেখ করেন "পর্দ্দার উদ্দেশ্য সতীত্ব রক্ষা। নারীর চরিত্র নির্ভর করে তাহার শিক্ষার উপর, স্বামীর নিয়ন্ত্রণের উপর, পারিপার্শ্বিকতার উপর। সারা দিবারাত্র কেবল কারাবদ্ধ থাকিলে তাহার মনোবৃত্তির প্রসার হয় না। কর্ম্মশক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ হয় না। আত্মার স্ফুরণ চাই, মহিলা সমাজের সংস্পর্শ চাই, প্রাকৃতিক রহস্যের তফক্কোর চাই।" (--- --- ---, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ---)।

উপসংহার: পরিসীমিত মন্তব্যে বলা যায়, আদর্শ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বহুকাল আগে দেওয়া শিক্ষা নির্দেশনা অনুসরণ করে এখনো যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই তাদের কাঙ্খিত সাফল্যে সমর্থ হতে পারে। শিশুরাও খুঁজেপেতে পারে তাদের সাফল্যের সিঁড়ি। আসুন, আমরা সবাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নির্দেশিত পথে এগিয়ে যাই। সু-শিক্ষা, সু-শাসন ও সু-ব্যবস্থাপনা প্রসারে ব্রতী হই।

তথ্যসূত্র: (হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রহ. রচিত গ্রন্থসমূহ)
১. 'আমার জীবন ধারা'
২. 'ইসলামের ইতিবৃত্ত'
৩. 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান' প্রবন্ধ পুস্তক (১৯১৮)
৪. 'টিচার্স ম্যানুয়েল' (১৯১৫)।

গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।
মো. হাবিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক, মানবসম্পদ বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।
প্রশান্ত ডেভিড সাধু খাঁ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইউসিএলসি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে অনুষ্ঠিত অষ্টম সেমিনারে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে (বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ এ) উপস্থাপিত।*

প্রাক শিখনে মাতৃভাষা পেয়ে হাস্যোজ্জ্বল পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিশুরা

প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই জনগণকে সাক্ষর করে তোলার চেষ্টা চলছে বহু বছর ধরে। আশা ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। সেটা এখনও সম্ভব হয়নি। এবারের ২০১৯ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য ***'বহু ভাষায় সাক্ষরতা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা'*** আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে যে একটি দেশে প্রচলিত সকল ভাষাকে প্রাক-শিখনে গুরুত্ব দিতে হবে। যার যে ভাষা তাকে সেই ভাষাতেই সাক্ষর করে তোলার উদ্যোগ না নিলে পুরো জাতিকে সাক্ষর করে তোলার কর্মসূচি সফল হবে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালের হিসাবে দেশে বর্তমানে ৫০ থেকে ৬৭ বছর পর্যন্ত সাক্ষরতার হার ৭৩.৩ শতাংশ এবং ৭ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ৭৩.২ শতাংশ। গড় সাক্ষরতার হার ৭৩.৯ শতাংশ।

তবে বেসরকারি সংস্থা 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ২০১৬ সালে সাক্ষরতার হার নিয়ে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, সাক্ষরতার হার ৫১.৩ শতাংশ। তবে বর্তমানে এনজিওগুলোর কোনো জরিপ না থাকলেও বেসরকারি হিসাবে সাক্ষরতার হার প্রায় ৫৭ শতাংশ বলে মত সংশ্লিষ্টদের।

সাক্ষর কারা

সাক্ষর বলতে কোন স্তরকে বোঝাবে? বিবিএসের মতে, একজন ব্যক্তি পড়তে ও নিজের নাম লিখতে পারলেই সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি জরিপে একজন মানুষ লিখতে ও পড়তে পারে কি না, তা যাচাই করা হয়। আর আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুযায়ী, সাক্ষরতা হলো পড়ার পাশাপাশি অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে ও লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেউ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলে সাক্ষরতাসম্পন্ন ধরা হয়। যদিও গণসাক্ষরতা অভিযানের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে পঞ্চম শ্রেণি পাস করা অনেক শিক্ষার্থী সাক্ষরজ্ঞান হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাটুকুও অর্জন করতে পারে না। ফলে সরকারিভাবে চিহ্নিত সাক্ষরতার হার নিয়ে বিশেষজ্ঞ

বিশেষজ্ঞদের মতে, কেউ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলে সাক্ষরতাসম্পন্ন ধরা হয়। যদিও গণসাক্ষরতা অভিযানের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে পঞ্চম শ্রেণি পাস করা অনেক শিক্ষার্থী সাক্ষরজ্ঞান হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাটুকুও অর্জন করতে পারে না। ফলে সরকারিভাবে চিহ্নিত সাক্ষরতার হার নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে মতানৈক্য রয়েছে।

মহলে মতানৈক্য রয়েছে।

বিবিএসের তথ্যানুযায়ী, দেশে এখন জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫৫ লাখ। এই সংখ্যা থেকে স্কুলে ভর্তির জন্য যারা এখনো উপযোগী নয় তাদের বাদ দিয়ে সরকারিভাবে এখন সোয়া ৩ কোটি ও বেসরকারিভাবে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি লোক নিরক্ষর। আর এদের সাক্ষরতার আওতায় আনার ব্যাপারে গণসাক্ষরতা অভিযানের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হলেও তা বেশ ধীরগতিসম্পন্ন, বছরে মাত্র ০.৭ শতাংশ। অগ্রগতির হার পঠন ও লিখন দক্ষতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো হলেও গাণিতিক দক্ষতা এবং দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা খুবই কম। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি যদি এই হারে চলতে থাকে তাহলে সাক্ষরতা দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতেই বাংলাদেশের সব নাগরিকের আরো ৪৪ বছর এবং অগ্রসর পর্যায়ে উন্নীত হতে ৭৮ বছর লাগবে।

মাতৃভাষায় প্রাক শিক্ষন

গণসাক্ষরতার প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই ছিল অসাক্ষর। ২০১৬ সালে এসেও এই অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষার বর্তমান মান নিয়ে জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশের প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ছয় থেকে সাত বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন। এবং তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীর অগ্রসর পর্যায়ে সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ১০ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন।

> এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্যের প্রেক্ষিতে বলতে হয় সাক্ষর জাতি তৈরির লক্ষ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জরুরি। আর প্রাক-শিখনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল নিরক্ষর মানুষের সাক্ষর করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষার সাথে সাথে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় সাক্ষরতা উপকরণ প্রণয়ন করা তাই সময়ের দাবি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ গণমাধ্যমে বলেছেন, 'বর্তমানে যে প্রকল্পগুলো চলছে সেগুলো আমরা কঠোরভাবে মনিটর করছি। আর নতুন প্রকল্পগুলো পাস হলে সাক্ষরতা কার্যক্রম আরো জোরদার হবে। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এমডিজির লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি। আর ২০৩০ সালের মধ্যেই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারব।'

সাক্ষরতার হার বাড়াতে হবে

তবে সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন কিছুটা অসন্তেষই প্রকাশ করেন। গত এক বছরে সাক্ষরতার হার মাত্র ১ শতাংশ বাড়ায় তাঁর এই অসন্তোষ। দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সাক্ষরতার হার বাড়াতেই হবে। তিনি বলেন, 'আগামী পাঁচ বছরে দেশে ১ কোটি মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় আনা হবে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ গণমাধ্যমে বলেছেন, 'শিক্ষানীতিতে জাতীয় সাক্ষরতা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা এখনও হয়নি। আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত দক্ষতাও দিতে হবে। এটাকে একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।'

প্রাক-শিখনে মাতৃভাষার গুরুত্ব

এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্যের প্রেক্ষিতে বলতে হয় সাক্ষর জাতি তৈরির লক্ষ্যে মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জরুরি। আর প্রাক-শিখনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল নিরক্ষর মানুষের সাক্ষর করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষার সাথে সাথে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় সাক্ষরতা উপকরণ প্রণয়ন করা তাই সময়ের দাবি। বাংলাদেশে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। এরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ। বাংলাদেশের এসব আদিবাসী জাতিগুলোর অধিকাংশ ভাষারই নিজস্ব লিপি নেই। তবে সবারই রয়েছে অনেকটা নিজস্ব লিখিত রূপের প্রচলন। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, রাখাইন ইত্যাদি ভাষা নিজস্ব লিপিতে লেখা হয়। ককবরক (ত্রিপুরাদের ভাষা), বম, লুসাই, পাংখোয়া, গারোসহ কয়েকটি ভাষা রোমান লিপিতে লেখা হয়। ভাষাবিষয়ক তথ্য সরবরাহকারী ওয়েবসাইট এথনোলগের মতে, বর্তমান পৃথিবীতে আনুমানিক ৭ হাজার ৯৭টি ভাষা বেঁচে আছে। এর মধ্যে ২ হাজার ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা ১ হাজারের কম। এছাড়া মোট ভাষার মাত্র অর্ধেকের আছে লিখিত রূপ। এসব ভাষায় ব্যবহার করা হয় ৪৬ ধরনের বর্ণমালা। বাকিগুলো শুধু মৌখিকভাবেই চর্চিত আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ২৩ নম্বর ধারাটিতে বলা আছে, 'দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার

বিকাশ ঘটানোর কথা' এবং একই শিক্ষানীতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে (প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা) 'আদিবাসী শিশু' শিরোনামের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে, সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।' সেটিরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে পাঁচটি ভাষায় প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কর্মসূচিও চলছে। ওদের সম্প্রদায় থেকে এখনও মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া যায়নি যাঁরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে পারবেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থী মাতৃ ভাষায় পারদর্শী নয়, তারা অন্যদের তূলনায় পিছিয়ে থাকে। মাতৃভাষায় শিখন শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা না গেলে স্বাভাবিকভাবেই সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। যে কারণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে (ডাম) মাতৃভাষা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাম নানামুখী ও সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা উপকরণমালা তৈরি, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ফ্লাশকার্ড, চার্ট, বিভিন্ন ভাষায় ছড়া ও গল্পের বই, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুরা সহজেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। এখন বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা শিখন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি শিশুদের একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ডাম উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল অভিজ্ঞতার আলোকে পাহাড়ি সকল শিশুর শিক্ষা মজবুত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয় প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিখন কেন্দ্র। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনের পাহাড়ি জনপদে পরীক্ষামূলকভাবে ২৮টি কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মাতৃভাষা শিক্ষার সূচনা হয়।"

মাতৃভাষায় শিখন শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা না গেলে স্বাভাবিকভাবেই সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। যে কারণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে (ডাম) মাতৃভাষা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাম নানামুখী ও সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা উপকরণমালা তৈরি, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ফ্লাশকার্ড, চার্ট, বিভিন্ন ভাষায় ছড়া ও গল্পের বই, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ

মিশন পরিচালিত 'প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা শিক্ষা' একটি অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগী কর্মীরা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবন সদর ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় মাতৃ ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব ভাষায় শিক্ষা লাভ করছে এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ তিনটি আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ভিত মজবুত করেছে। এ শিক্ষা মডেলটি ব্যবহার করে আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে এবং অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকে মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ মডেলটি প্রয়োগ করে বর্তমানে বিভিন্ন খিয়াংয়ে (প্রার্থনালয়ে) স্থানীয় আদিবাসী ও বৌদ্ধ ভান্তেগণ শিশুশিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন।

এ উদ্যোগের চ্যালেঞ্জ এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাতৃভাষা শিখন

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগী কর্মীরা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবন সদর ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে

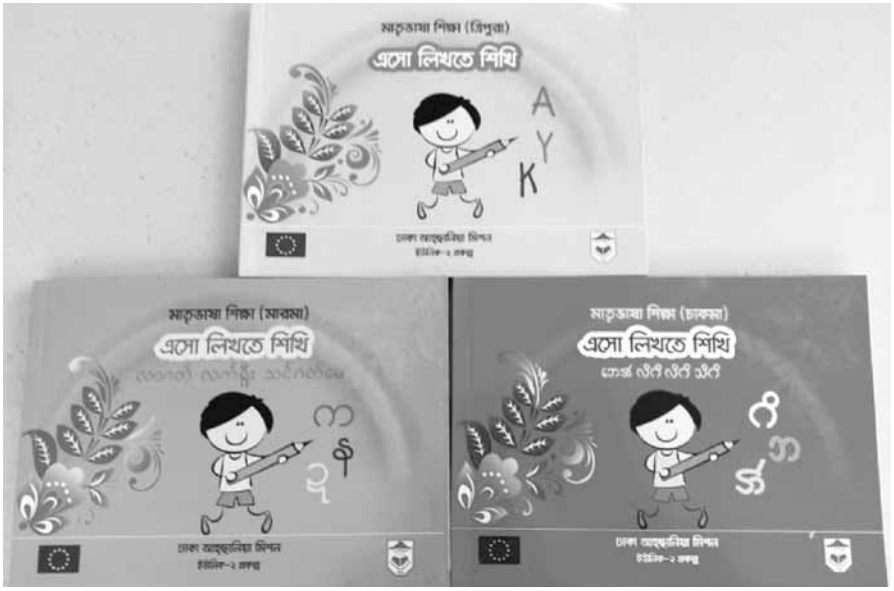

পরিচালানায় যোগ্য শিক্ষক খুঁজে পাওয়া-ও কঠিন; প্রশিক্ষিত শিক্ষকদেরকে টিকিয়ে রাখাও বেশ চ্যালেঞ্জ, একই এলাকায় বিশ্র ভাষাভাষীয় অবস্থান। ফলে একটি কেন্দ্রের জন্য একই ভাষার ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না; সকলের জন্য মাতৃভাষা চর্চা করানোর জন্য যথাযথ উপকরণেরও ঘাটতি রয়েছে, এছাড়াও ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মূলধারার ভাষার প্রাধান্য তো রয়েছেই এজন্যও কিছু অভিভাবক এবং কমিউনিটি সদস্য শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন।

কেন এটি অনুসরণীয় উদাহরণ : যেসব কারণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত 'প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা শিক্ষা' একটি অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগী কর্মীরা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে;
- চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শিশু শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব ভাষা শিক্ষা লাভ করেছে;
- এলাকার চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষাভাষী জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে;
- মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য শিখন-উপকরণ তিনটি ভাষায় ছড়ার বই, ভোকাবুলারি, বর্ণ-চক্রচার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। তৈরি করা হয়েছে;
- আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ভিত মজবুত হয়েছে;
- এ শিক্ষা মডেলটি অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকে মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিতে ও তা বাস্তবায়ন করতে পারবে;

- আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখা ও তা ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছে;
- এ মডেলটি প্রয়োগ করে বর্তমানে বিভিন্ন খিয়াংয়ে (প্রার্থনালয়ে) স্থানীয় আদিবাসী ও বৌদ্ধ ভান্তেগণ শিশু শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন।

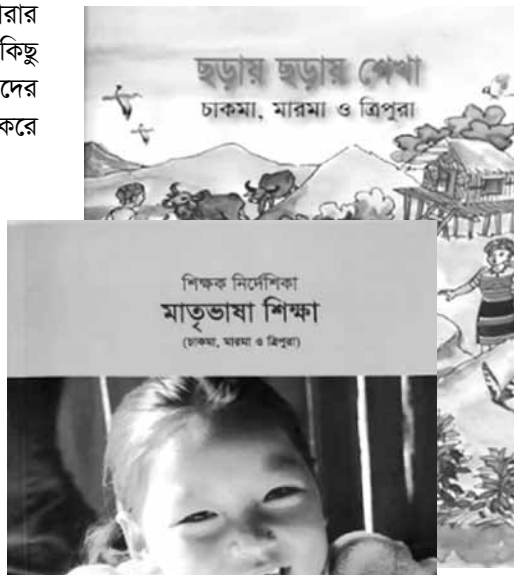

বৈচিত্র্যময় ভাষা ও সংস্কৃতির এই দেশে এসব বৈচিত্র্য টিকিয়ে ও সংরক্ষণ করতে হলে মাতৃভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই।

সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন :

দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরক্ষরতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের হার প্রায় কাছাকাছি। সরকারি হিসাবে ২৬ শতাংশ নিরক্ষর আর দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশ। যে মানুষকে পরিবারের সদস্যদের ভাত-কাপড়ের জোগাড় করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়, তিনি সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি না করে কাজে পাঠান বাড়তি উপার্জনের জন্য। এসব দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনা নিশ্চিত করতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সাক্ষরতার হার বাড়ানো নিয়ে পূর্বাপর সরকার একের পর এক প্রকল্প নিয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু সেসব প্রকল্প যে খুব বেশি সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। ২০১৯ সালের শেষার্ধে এসে নীতিনির্ধারকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পাঠকক্ষে ধরে রাখতে দুপুরের খাবার ও পোশাক দেওয়ার কথা ভাবছেন। কয়েকটি এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালুও আছে। উদ্যোগটি ভালো। কিন্তু এটিকে সফল করতে হলে শুধু সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের ওপর ভর করলে হবে না; স্থানীয় জনগণকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। পাশাপাশি মাতৃভাষায় প্রাক-শিখন ব্যবস্থাটিও সফল করে তুলতে হবে। দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন একটি বাস্তবমুখী, টেকসই ও সমন্বিত পদক্ষেপ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

<u>সহায়ক রচনা</u>

শরীফুল আলম সুমন, *আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ সাক্ষরতার হার বাড়াতে শুধুই ফাঁকা বুলি* কালের কণ্ঠ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

জোবাইদা নাসরীন, *সংখ্যালঘুর ভাষা রক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের*; প্রথম আলো ৯ অগাস্ট ২০১৯ পৃ. ১১

শাহীন আখতার, *"বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা" মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ*; কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষা সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সিরাজুদ দাহার খান, গবেষণা ও উন্নয়ন, গোলাম ফারুক হামিম, সম্পাদনা; *প্রাথমিক শিক্ষায় অনুসরণীয় উদাহরণ/ প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা শিক্ষা/ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিজ্ঞতা*, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৯

শিক্ষায় নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

কাজী আলী রেজা

নৈতিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের যাত্রা শুরু ১৩ জানুয়ারি ২০১৮

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা বা নীতি শিক্ষা ও চরিত্র গঠন বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে শিক্ষা, নৈতিক বা নীতি শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই আসা যাক শিক্ষা কী সে বিষয়ের আলোচনায়। শিক্ষা হলো তা, যা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তাহলে একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরিবর্তনই শিক্ষা। শিক্ষা বিষয়ে বিশ্বে নানা গুণিজন নানা মত দিয়েছেন। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন "মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ"। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা"। অন্যদিকে বাঙালি কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা বিষয়ে বলেছেন "শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না; বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে"।

> মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা দ্বারা মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হয় না, তা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য নয়।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সুফি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর রচিত 'টিচারস্ ম্যানুয়েল'-এ শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম ও চরিত্র গঠন নিয়ে যে মতামত ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, আজ শতবর্ষ পরও তা গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাঁর মতে, মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা দ্বারা মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হয় না, তা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য নয়। পরীক্ষায় কৃতকার্যতাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। কেউ বিদ্বান হলেই প্রকৃত শিক্ষিত হবেন– এমন দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়।

ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের নৈতিক বোধ সমুন্নত না থাকায় তাদের মধ্যে কোনো রকম শোভন আপস করাও স্বাভাবিক ছিল না। তারা ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের বা উচিত-অনুচিতের ধার ধারত না। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

শিক্ষার ধারণা এবং গুণিজনদের কথাগুলোর মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ের ঐক্য রয়েছে; আর তা হলো মানুষের মানবিক, নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশই হলো শিক্ষার মূল কথা। এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলোর কতটুকু অর্জিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে এই প্রবন্ধে আরো যে বিষয়গুলো আলোচনার দাবি রাখে এখন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

নৈতিকতা বা নীতি শিক্ষাই বা কী? আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়? সে বিষয়ে কথা বলার আগে নীতি কী তা ব্যাখ্যা করা দরকার। নীতি হলো নিয়ম। একে আবার আইনও বলা যেতে পারে। অন্যদিকে একে সামাজিক প্রথাও বলা যেতে পারে কিন্তু এখানে নীতি বলতে নীতিবিদ্যায় উল্লেখিত মানব সমাজের ভালো এবং মন্দ আচরণ বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা ও নির্দেশনা প্রদানই বোঝায়। এই ইথিকস্ বা নীতিবিদ্যা শব্দের উৎপত্তি মূলতঃ

প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'ইথিকোস্' থেকে; যার অর্থ অভ্যাস, প্রথা, চরিত্র, জীবনাচার প্রভৃতি। তবে এসব অর্থের সাথে মূল্যবোধের সম্পর্কটিও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এক কথায় আমরা বলতে পারি, নীতিবিদ্যা মানব সমাজের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করে। নিবন্ধের এই পর্যায়ে এসেও দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার সাথে নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

শিক্ষার সাথে নৈতিকতা বা নীতির বিষয়টি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা কখনোই পূর্ণতা অর্জন করে না; যতক্ষণ অর্জিত জ্ঞান বা আচরণের সাথে নীতি বা নৈতিকতা না থাকে। তাহলে একথা বলাই যায় যে, নীতিহীন শিক্ষা আসলে শিক্ষা নয়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানব তথা বিশ্ব সংসারের মঙ্গল সাধন করা। মানুষের অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যদি মানুষের কল্যাণ না করে অকল্যাণ থেকে কিংবা অপরের ক্ষতি করে তাহলে সেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় নিশ্চয়?

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিত বিবেচনায় বিশেষ করে বাংলাদেশের সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় এ প্রশ্ন আজ উচ্চারিত হতে শুরু হয়েছে যে, আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষত করে তুলতে পারছি? আপাত দৃষ্টিতে দেখলে একথা বলা যায় যে, আমাদের দেশে লোকে লেখা-পাড়া শিখছে ঠিকই কিন্তু নীতি বা নৈতিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। যদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নীতি বা নৈতিকতার বিষয়টি যথাযথভাবে অনুরসরণ করা হতো তাহলে অন্তত সমাজের সর্বক্ষেত্রে এত অনৈতিক চর্চা হতো না। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র আছে কী যেখানে অনৈতিকতা নেই? ব্যবসা ক্ষেত্রে ভেজালে ভরা, অফিস আদালতে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না, ব্যাংকের টাকা লোপাট হচ্ছে ইচ্ছেমতো, শেয়ারবাজার কালোবাজারির দখলে, স্বাস্থ্যখাত দুর্নীতি মুক্ত নয়, শিক্ষায় বাণিজ্য ও নকলের ছড়াছড়ি, ভূমি অফিস ও বিআরটিএ দালালে ভরা। সত্যি কথা বলতে সরকারি এবং বেসরকালি এমন অফিস খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ হয় না।

এবারে একটু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া যাক। স্বাধীনতা পরবর্তী বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ অবধি দেশের এবং

বাংলাদেশের সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় এ প্রশ্ন আজ উচ্চারিত হতে শুরু হয়েছে যে, আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষত করে তুলতে পারছি? আপাত দৃষ্টিতে দেখলে একথা বলা যায় যে, আমাদের দেশে লোকে লেখা-পাড়া শিখছে ঠিকই কিন্তু নীতি বা নৈতিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বিশ্বের জন্য যোগ্য মানবিক নাগরিক তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এদেশে। শিক্ষা কমিশন হয়েছে বেশ কয়েকটি কিন্তু এর একটিরও যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীতি হয়েছে এবং এটিরও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন এবং সংশয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে যে," শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষানীতিতে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতির সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা

নৈতিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে শুধু ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ) ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়গুলোকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান এবং পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ন করলে হবে না। ধর্মসহ অন্যান্য নৈতিক ও মানবিক চিন্তা, দর্শন, কর্ম আলোচনার পাশাপাশি চর্চার ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে হবে।

হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য (ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামে একটি করে পাঠ্য পুস্তক পড়ানো হয়। মুসলিমদের জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিষ্টানদের জন্য খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামের বই পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি শিক্ষার জন্য শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকার পরও কী যথেষ্ট পরিমাণ নীতিবান ও মানবিক নাগরিক তৈরি হচ্ছে? যদি সত্যি সত্যিই নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পাঠকক্ষগুলোতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হতো তাহলে সমাজে এবং পরিবারে নীতি বর্জিত কর্মকাণ্ডের যে মহা উৎসব চলছে, তা নিশ্চই হতো না বা অনৈতিকতা মহামারি আকারে সমাজ তথা দেশকে গ্রাস করতে পারত না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশ কী এভাবেই চলবে নাকি মানবিকাতার দিকে ফিরবে? নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য করণীয়ই বা কী কী? এক কথায় হয়তো এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু নৈতিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে শুধু ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ) ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়গুলোকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান এবং পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ন করলে হবে না। ধর্মসহ অন্যান্য নৈতিক ও মানবিক চিন্তা, দর্শন, কর্ম আলোচনার পাশাপাশি চর্চার ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনে পালন ও চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে একটি নৈতিক সমাজ কিংবা দেশ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

কাজী আলী রেজা, যুগ্ম সম্পাদক, আলোকিত বাংলাদেশ

জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করছেন ড. মো. শাহ আলম মজুমদার

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ কাঠামো উন্নয়নে সিনেড

শাহনেওয়াজ খান

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক শিল্প তৈরি পোশাক শিল্প। তৈরি পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশ তার রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জন করে যা দেশের মোট জিডিপির আনুমানিক প্রায় ১৪ শতাংশ। গত ২৫ বছর ধরে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস। এই শিল্পের তত্ত্বাবধায়ক/কর্মকর্তাদের চাহিদা ভিত্তিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থ াকায়, এই শিল্পের প্রসার ঘটার সাথে সাথে দক্ষ কর্মকর্তার অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বিদেশি দক্ষ কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাবে তৈরি পোশাক শিল্পগুলোতে লক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে যার প্রভাব পড়েছে দেশের রপ্তানি আয়ে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক/ সুপারভাইজারদের জন্য কারখানা পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক কিছু কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডামের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (সিনেড) কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর একটি উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের রুপরেখা উন্নয়নে কাজ করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মস্থলভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের একটি মডেল উদ্ভাবন ও স্বল্প পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে। এই কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সম্প্রতি সিনেড, কমনওয়েলথ অব লার্নিং (COL) এর আর্থিক সহায়তায় 'Situation analysis of the Workplace Based Training in the RMG Sector in Bangladesh' শিরোনামে একটি জরিপের কাজ শেষ করেছে।

> জরিপে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় অ্যাপ্রোচ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্নপত্র, মাঠ পরিদর্শন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা ও ধরন পর্যালোচনা করা ও এই শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণের উপযোগিতা নিরুপণ করা।

এই জরিপ কাজে যে সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা হলো :

১. প্রশিক্ষণের ধরন, প্রশিক্ষণের স্থান, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী, প্রশিক্ষণের

সময়কাল ইত্যাদির বিদ্যমান অবস্থা।

২. প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষক এবং সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া।

৩. প্রশিক্ষণে ব্যয়িত অর্থের উৎস এবং ব্যয়িত অর্থের খাতসমূহ।

৪. কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অভিমতসমূহ ও সাফল্যের কাহিনী।

৫. প্রশিক্ষণে ব্যয়িত অর্থের উপযোগিতা বিষয়ে সংশিষ্টদের অভিমত।

৬. কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাবলী।

৭. কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবতা।

৮. মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা।

৯. মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা দূর করার জন্য দক্ষতার ঘাটতিসমূহ।

জরিপ ফলাফল উপস্থাপন কর্মশালার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সিনেড এই জরিপ কাজটি সম্পাদনের জন্য "Center for Occupational Research and Education" (CORE) কে দায়িত্ব প্রদান করে। এই জরিপ কাজটি একজন দলনেতার নেতৃত্বাধীন 'CORE' এর টিম দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। টিমের সদস্যরা ছিলেন টেকনিক্যাল ও ভকেশনাল শিক্ষা ও তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ। জরিপে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় অ্যাপ্রোচ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্নপত্র, মাঠ পরিদর্শন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নথি পত্র, ডকুমেন্ট ও প্রতিবেদন থেকে সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলকে তিনটি অঞ্চলে (ঢাকা অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ও গাজীপুর অঞ্চল) ভাগ করে প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ২টি করে মোট ৬টি তৈরি পোশাক কারখানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই জরিপে তিন ধরনের প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। চাকুরিদাতাদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র, মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র ও প্রশিক্ষকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র। প্রত্যেকটি প্রশ্নপত্র ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত। (১) সাধারণ তথ্য, (২) প্রশিক্ষণের নিয়ম, অনুশীলন, প্রশিক্ষক, পদ্ধতি, আলোচ্য বিষয়সমূহ, ব্যয় ও ব্যয় বহনকারী (৩) প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি। জরিপ টিম সর্বমোট ৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

এই জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনের জন্য গত ২ আগস্ট, ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কনফারেন্স রুমে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় জরিপ পদ্ধতি ও প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়। এই কর্মশালায় NSDA,CEBAI, BGMEA, ILO ও BTEB এর প্রতিনিধি এবং ৮টি ফ্যাক্টরির কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যেকেই এই জরিপ কাজটির প্রশংসা করেন এবং মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের পেশাগত উন্নয়নে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপস্থিত সকলে তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান। উপস্থিত সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জরিপের ফলাফল ও সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের কাঠামো উন্নয়নে মিশনের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণের ধরন সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারী তিন ধরনের কর্মকর্তাদের মিলিত অভিমত

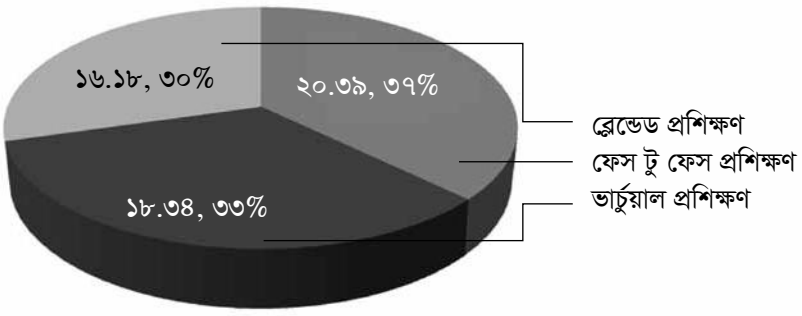

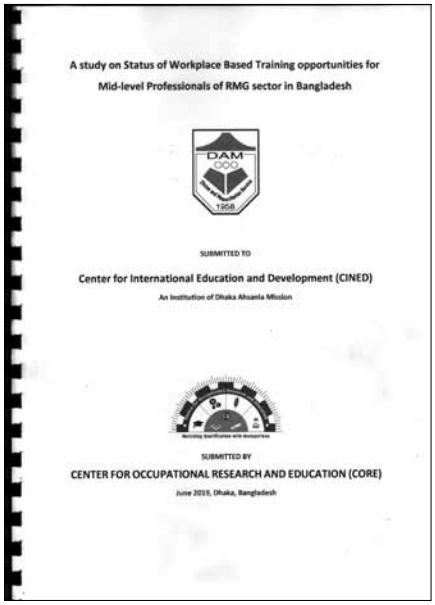
A study on Status of Workplace Based Training opportunities for Mid-level Professionals of RMG sector in Bangladesh

SUBMITTED TO

Center for International Education and Development (CINED)

An Institution of Dhaka Ahsania Mission

SUBMITTED BY

CENTER FOR OCCUPATIONAL RESEARCH AND EDUCATION (CORE)

June 2019, Dhaka, Bangladesh

শাহনেওয়াজ খান, সিইও, সিনেড
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়ে

জীবনব্যাপী শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা

নাফিজ উদ্দিন খান

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল 'হাই কেয়ার'-এর একদল শিশু সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে

জীবনব্যাপী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গত ৫ ও ৬ জুলাই ২০১৯ 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা' বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে এক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল) এবং স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেনের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের (Dept. of Special Education) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় বাংলাদেশ, ভারত ও সুইডেনের ৫০ জন অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিছিলেন রয়েল ইউনির্ভাসিটি অব ঢাকা'র উপাচার্য্য অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার। বিআইএলএল-এর পরিচালক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য স্বাগত বক্তব্যে বলেন, 'ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সমাজে শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জড ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মরত ব্যক্তিদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 'স্প্যাসাল এডুকেশন' বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় এবং ফলপ্রসূ কার্যক্রম ও গবেষণা পরিকল্পনার লক্ষ্যেই এই কর্মশালা। তিনি এই কর্মশালা আয়োজনে সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করার জন্য স্টকহোম ইউনিভার্সিটি, সুইডেন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সেরিব্রাল পালসে, কোলকাতাকে এবং বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার বলেন, "ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ব্যক্তিদের সংখ্যা সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেজন্য 'স্প্যাসাল এডুকেশন' বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করার এটাই যথাযথ সময়"। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে এই কর্মশালা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে জনাব কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সমাজের পিছিয়ে পড়া সকল মানুষের জন্য কাজ করে। তিনি এই কর্মশালয় আগত সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কর্মশালা উদ্বোধনীর পর শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল 'হাই কেয়ার'-এর একদল শিশু সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কর্মশালা উদ্বোনের পর স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা এবং বাংলাদেশের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের উপস্থাপন এবং আলোচনা শুরু হয়। প্রথমেই উপস্থাপন করেন স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. খালেদা গানি। তার উপস্থাপনের বিষয় ছিল 'Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities, Disability and the 2030 Agenda for Sustainable Development'। ড. গানি Sustainable Development Goals এ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে কীভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করেন।

এরপর স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস লিজ অ্যাডামস লিংব্যাক উপস্থাপন করেন 'Parents, experiences and disability knowledges'। মিস লিজ তার উপস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বিস্তারিত

আলোচনা করেন।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মি. জারি লিইনকো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর আলোচনা করেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সেরিব্রাল পালসে, কোলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, ট্রাস্টি এবং ভাইস চেয়ারম্যান ড. সুধা কোল এবং গভর্নিং বডির সদস্য মিসেস রানু ব্যানার্জি উপস্থাপন করেন 'Principles of Planning Lifelong Learning & Teaching Modules for Persons with Special Needs'। **প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখন বিষয়ক নানারকম চ্যালেঞ্জ, এজন্য করণীয় সমূহ, রিসোর্স, পার্টনারশিপ; বেবি ক্লিনিক, টিম এপ্রোচ, টেকনোলোজি ইনক্লুশন ইত্যাদি উপস্থাপন ও আলোচনা করেন।**

কর্মশালায় এরপর 'Autism Spectrum Disorder : Causes, Intervention Plan, Challenges for the Families and Bangladesh Scenario' বিষয়ে উপস্থাপন করেন ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. তোফায়েল আহমেদ। ডা. তোফায়েল তার উপস্থাপনায় অটিজম কী, বিশ্বে এবং বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি, অটিজম ডিজঅর্ডার সম্পর্কে জানার বিষয়, অটিজমের অভিজ্ঞতা, অটিজমের লক্ষনসমূহ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল হাই-কেয়ার-এর মিসেস কানিজ ফাতেমা উপস্থাপন করেন হাই-কেয়ার-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের কীভাবে উন্নয়ন করা হয়, ব্যবহৃত মিশনসমূহ ইত্যাদি বিষয়।

কোলকাতা আগত বিশিষ্ট দাবা বিশেষজ্ঞ, ন্যাশনাল আর্বিটার, কোলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলের নিলয় চক্রবর্তী উপস্থাপন ও আলোচনা করেন দাবা খেলা কীভাবে অন্ধ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নে সহায়তা করে। তিনি দাবা খেলার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের অনেক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ইনক্লুসিভ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপস্থাপন করেন সুলতানা কানিজ ফাতেমা।

কর্মশালার শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং-এর পরিচালক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং বিশেষ চাহিদা ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করবে, এজন্য স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেনের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের সাথে পার্টনারশিপ গড়ে তুলবে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সেরিব্রাল পালসে, কোলকাতার সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক একটি পিয়ার রিভিউড জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ নেবে। কর্মশালার অংশগ্রহণকারী সকলেই তার এই প্রস্তাবনা সমর্থন করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নাফিজ উদ্দিন খান, প্রোগ্রাম অফিসার
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং

'আর্লি চাইল্ড এডুকেটর' কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল) এবং উই লার্ন লিঃ-এর উদ্যোগে শিশু পরিচর্যা বিষয়ক ৮ সপ্তাহব্যাপী কোর্সের প্রথম ব্যাচের সার্টিফিকেট বিতরণ গত ৩১ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু শিক্ষা, শিশুর লালন পালন এবং ডে-কেয়ার পরিচালনা/শিক্ষকতা বিষয়ক ৮ সপ্তাহের কোর্স 'আর্লি চাইল্ড এডুকেটর' গত ২১ জুন ২০১৯ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে শুরু হয় এবং ২৪ আগস্ট ২০১৯ শেষ হয়। প্রতি শুক্র ও শনিবার অনুষ্ঠিত এই কোর্সে ১৭ জন অংশগ্রহণ করেন। সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান, মিডিয়া কনসাল্টেন্ট চিন্ময় মুৎসুদ্দী এবং বিআইএলএল-এর পরিচালক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষকদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

নববর্ষ হিজরি ১৪৪১ উদযাপন ভ

শুভ হিজরি নববর্ষ ১৪৪১

মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হিজরি সাল ১৪৪০ বিদায় নিয়ে এলো নববর্ষ ১৪৪১ সন। ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান হিজরি সন তথা আরবি তারিখ ও চান্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরি সনের ওপর নির্ভরশীল। যেসব ঐতিহাসিক উপাদান মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত করে তন্মধ্যে হিজরি সন অন্যতম। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সভ্যতা সংস্কৃতিতে ও মুসলিম জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব অপরিসীম। হিজরি সনের সাথে মুসলিম উম্মাহর তাহজীব-তামাদ্দুনিক ঐতিহ্য সম্পৃক্ত।

মানব জীবন সময়ের সমষ্টি। সময়কে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী করে আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন: দিন রাত, মাস, বছর ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস ১২টি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (৯:৩৬)। "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং উহাদের মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" (১০:৫)। "আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য অমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।" (৩৬:৩৮-৩৯)।

তৎকালীন আরবে সুনির্দিষ্ট কোনো সন প্রচলিত ছিল না। বিশেষ ঘটনার নামে বছরগুলোর নামকরণ করা হতো। যেমন, বিদায়ের বছর, অনুমতির বছর, হস্তির বছর ইত্যাদি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) যখন খলিফা হন, তখন বহু দূর পর্যন্ত নতুন ও ভূখণ্ড ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র ইত্যাদিতে সন তারিখ উল্লেখ না থাকায় অসুবিধা হতো। আল বেরুনির বিবরণী থেকে জানা যায়, হজরত আবু মূসা আশআরী (রা.) একটি পত্রে উমর (রা.) কে অবিহিত করেন, সরকারি চিঠিপত্রে সন তারিখ না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হজরত উমর (রা.) একটি সন চালু করেন। আল্লামা শিবলী নোমানী (র.) হিজরি সনের প্রচলন সম্পর্কে 'আল ফারুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: হজরত উমর (রা.) এর শাসনামলে ১৬ হিজরি সনের শাবান মাসে খলিফা উমরের কাছে একটি দাপ্তরিকপত্রের খসড়া পেশ করা হয়, পত্রটিতে মাসের উল্লেখ ছিল; সনের উল্লেখ ছিল না। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা কীভাবে বোঝা যাবে এটি কোন সনে পেশ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে হজরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, হিজরতের ১৬ বছর পর ১০ জুমাদাল উলা ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। হিজরতের বছর থেকে সন গণনার পরামর্শ দেন হজরত আলী (রা.)। পবিত্র মুহাররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষ হিজরি সনের শুরু করার ও জিলহজ মাসকে সর্বশেষ মাস হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন হজরত উছমান (রা.)। (বুখারি ও আবু দাউদ)।

হিজরতের বছর থেকে সন গণনার পরামর্শ দেন হজরত আলী (রা.)। পবিত্র মুহাররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষ হিজরি সনের শুরু করার ও জিলহজ মাসকে সর্বশেষ মাস হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন হজরত উছমান (রা.)। (বুখারি ও আবু দাউদ)।

৬২২ সালের জুন মাসের শেষার্ধে আরবি রবিউল আউওয়াল মাসে প্রিয় নবীজি (স.) এর মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের ঘটনা মুসলমানদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সে নিরিখেই ইসলামী 'হিজরি সন" সন প্রবর্তন করা হয়। হিজরত মানে ছেড়ে যাওয়া, পরিত্যাগ করা; দেশান্তর হওয়া ও দেশান্তরিত করা। পরিভাষায় হিজরত হলো- ধর্মের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যাওয়া। কামনা বাসনা বিসর্জন দেওয়া, সংযম অবলম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্রন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য পরিত্যাগ করাই হিজরতের মূল দর্শন।

রাসুলুল্লাহ (স.) মদীনাবাসীদের দীনী দাওয়াত ও তালিমের জন্য হজরত মুস আব

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা ইজহারুল হক

০ উদযাপন

ইবনে উমায়ের (রা.) ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কে প্রেরণ করলেন। এর পর হজরত আম্মার (রা.), হজরত বিলাল (রা.) ও হজরত সাআদ (রা.) কে মদীনায় প্রেরণ করলেন।

অবশেষে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে রসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলে আকরাম (সা.) মদীনা মুনাওরায় প্রবেশের আগে কুবায় বনী সালেম উপত্যকায় অবস্থান করলেন। তিনি তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন, এটি মদীনার প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণের সময় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সবার সাথে পাথর-মাটি বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর নবী কারিম (সা.) জুমুআর দিনে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

নবীয়ে আকরাম (সা.) যখন মদিনা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে বরণ করার জন্য তাঁর উষ্ট্রীর দড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও। যেখানে সে বসবে, সেটাই হবে আমার বাসস্থান। তাকে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উষ্ট্রী বনু নাজ্জার গোত্রের এলাকায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নানার বাড়ি ছিল। এ গোত্রের হজরত আবু আইযুব আনসারী (রা.) এর বাড়ির সামনে গিয়ে উষ্ট্রী বসে পড়ল। এখানেই নবীয়ে আখেরুজজামান (সা.) এর বাসস্থান নির্ধারণ করা হলো। এখানেই গড়ে উঠল মসজিদে নববী ও মদিনাতুর রাসূল বা রাসূলের শহর। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, যাদুল মাআদ, তারীখুল ইসলাম)।

সময় আল্লাহর দান। নতুন বছর আসা মানে জীবনের নির্ধারিত আয়ু থেকে একটি বছর চলে যাওয়া। নতুন বছর আসা মানে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়া। বিগত সময়ের ব্যর্থতা গ্লানি ভুলে নব উদ্যমে নতুন সফলতার পানে এগিয়ে যাওয়া, অবারিত কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার শুভ যাত্রা। তাই নতুন বছরে হজরত আলী (রা.) বলতেন: "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ওয়াল আবছার, ইয়া মুদাব্বিরাল্লাইলি ওয়ান-নাহার; ইয়া মুহাওয়িলাল হাওলি ওয়াল আহওয়াল, হাওয়িল হালানা ইলা আহ্ছানিল হাল।" অর্থ: 'হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পরিবর্তনকারী! হে রাত ও দিনের আবর্তনকারী! হে সময় ও অবস্থা বিবর্তনকারী! আমাদের অবস্থা ভালোর দিকে উন্নীত করুন।' (দিওয়ানে আলী, আন নাহজুল বালাগা)।

নতুন বছরের সাথে আসে নতুন চাঁদ ও নতুন মাস। নতুন চাঁদে নতুন মাসে রাসুলে খোদা (সা.) পড়তেন: "আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াছ ছালামাতি য়াল ইছলাম; ওয়াত্-তাওফিকি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ; হিলালু রুশদিন ওয়া খায়র।" অর্থ: 'আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এই মাসকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান, প্রশান্তি ও ইসলাম সহযোগে আনয়ন করুন; আমাদের তাওফিক দিন আপনার মহব্বত ও সন্তুষ্টির; আমার ও তোমার প্রভূ আল্লাহ! এই চান্দ্র মাস সুপথ ও কল্যাণের।' (তিরমিযি: ৩৪৪৭ ও ৩৪৫১, মুসনাদে আহমাদ: ১৪০০, রিয়াদুস সলিহীন: ১২৩৬)।

বাংলা হিজরি সন:

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ মূল হিজরি সন থেকে এসেছে। বাদশাহ আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য তাঁর সভাসদ জ্যোতির্বিদ আমির ফতেহ উল্লাহ শিরাজীর সহযোগিতায় ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ থেকে 'তারিখ-এ-এলাহি' নামে নতুন এক বছর গণনা পদ্ধতি চালু করেন। নতুন এই সাল আকবরের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে চালু হলেও তা গণনা আরম্ভ হয় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকেই, কারণ ওই দিনেই তিনি 'দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ' জয়লাভ করেছিলেন। তৎকালীন হিজরি চান্দ্র বর্ষকে অপরিবর্তিত রেখে সৌর বর্ষ গণনা শুরু করেন। অর্থাৎ ওই বছর থেকে বাংলা মাসের হিসাবে ৩৬৫ দিনে বছর হিসাব করা হয়। যা পূর্বে চান্দ্র মাস হিসেবে ৩৫৫ দিনে বছর হিসেব হতো। তাই এটি সৌর ও চন্দ্র বর্ষের মিশ্রণ।

হিজরি সৌর বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষ:

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন: "সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের নিমিত্তে।" (সূরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ৫)। সৌর বর্ষ হয় সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনে। সৌর মাস হয় ৩০, ৩১ ও ২৮/২৯ দিনে। চান্দ্র বর্ষ হয় পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের আবর্তনে। চান্দ্র মাস হয় ২৯ ও ৩০ দিনে। এই কারণে চান্দ্র বর্ষ সৌর বর্ষ অপেক্ষা ১০/১১ দিন কম হয় তাই প্রতি ৩ বছরে ১ মাস বেড়ে যায় এবং ৩৬ বছরে ১ বছর বৃদ্ধি হয়। প্রতি শতাব্দীতে ৩ বছরের পার্থক্য হয়। আরব দেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিজরি সনের সৌর বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষ দুটি-ই চালু আছে। হিজরি সৌর বর্ষকে 'হিজরি শামসি' এবং হিজরি চান্দ্র বর্ষকে 'হিজরি কমারি'বলা হয়।

মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম

প্রতিবেদন

শিক্ষায় নতুন ধারা : ‘এবিএল মডেল ও লেট আস লার্ন প্রজেক্ট এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিজ্ঞতা’

সাইফুল করীম

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন করছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথ মিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় ৯৮ শতাংশের কাছাকাছি। শতভাগ ভর্তি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যে চারটি মডেলকে স্বীকৃতি দিয়ে বা নির্বাচিত করে সরকার সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি শুরু করেছিল সেই মডেলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মডেল হলো Five Steps Principles of MGTLA Model এবং ABL Model মডেল। সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি পরিচালনার এ কর্মযজ্ঞে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার Five Steps Principles of MGTLA Model বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা সফলভাবে প্রমাণ করে চলেছে।

পটভূমি : সরকারের বিভিন্ন তথ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগমনযোগ্য বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, দেশের অন্যান্য পিছিয়ে থাকা কিছু জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ অন্যতম। ভৌগলিকভাবে সুনামগঞ্জ জেলা হাওর এলাকা হিসাবে পরিচিত। ২০১৬ সালের Annual Primary School Census (APSC) এর রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, সুনামগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা শতকরা ৯২.৫ যা জাতীয় পর্যায় থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে। বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পরার হারও শতকরা ২৫ ভাগের ওপরে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের তথ্য-উপাত্তে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও এ চিত্রটি সমগ্র শিক্ষা পরিস্থিতিতে নেতিবাচক ভুমিকা রাখে। সরকারের সদিচ্ছা এবং বিগত দিনের অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রত্যাশা করা যায় যে, কিছু কিছু পরিকল্পিত কর্মসূচি এ চিত্রের ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারে। এরই আলোকে UNICEF এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বিদ্যালয় বহির্ভুত ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরির নিমিত্তে ‘লেট আস লার্ন’ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি দুই বছরে ১২ হাজার বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে যেখানে অন্তত ৫০ শতাংশ থাকবে মেয়ে শিশু। সরকারের সংশ্লিষ্টতা ও UNICEF এর সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

প্রজেক্ট ইনসেপশন প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা সুনামগঞ্জে

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় পরিচালিত প্রকল্প কাজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মোট ৬৫,৪৯২ জন উপকৃত হবে। প্রকল্পের আওতায় ভর্তিকৃত প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিশুরা সরকারি ডিজাইন অনুযায়ী এক বছর শিক্ষা সমাপ্ত করে মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা Ability Based Accelerated Learning (ABL) নামক সরকার অনুমোদিত নমনীয় মাল্টিগ্রেড শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষায়

অংশগ্রহণ করবে। এসব শিশুরাও ক্রমান্বয়ে মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে সেই সুযোগ তৈরি করা হবে।

এবিএল মডেল কী ও কেন :

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশুদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জনে সহায়তা করার জন্য এমন একটি শিক্ষাক্রম প্রয়োজন হয়, যেখানে ৮ থেকে ১৪ বয়সের শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে যার যার শিখনের মান অনুযায়ী শেখার সুযোগ পাবে এবং যার যার শিখনের গতি অনুযায়ী অগ্রসর হবে। অর্থাৎ যা হবে সম্পূর্ণ ভাবে Ability based, Flaxible and Activity based. এর ফলে শিশু অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে তার জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারবে।

শিক্ষাকে Ability based (যোগ্যতাভিত্তিক) করার জন্য প্রয়োজন শিশুর যোগ্যতা নির্ধারণ করা, শিশুর যোগ্যতাকে সামনে রেখে তার জন্য শিখন পরিকল্পনা করা, সে অনুযায়ী তাকে শিখতে সহায়তা করা এবং তার শিখন যাচাই করা। Ability based শিখন প্রক্রিয়ায় এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরি করা হয় যেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় নিজ শিখনের ধরন, গতি এবং অবস্থান নিজেই চিহ্নিত করতে পারে ও সে অনুযায়ী শিখনের পরিকল্পনা করতে পারে। অর্থাৎ এতে শিখন শিক্ষণের এমন একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় যাতে শিক্ষার্থী নিজ শিখনের ধরন এবং পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে পারে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়ন দক্ষতা, বিচারমূলক চিন্তার দক্ষতা এবং বিশ্লেষণী দক্ষতার উন্মেষ ঘটে। আর এর জন্য সম্পূর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের কর্ম তৎপরতার সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন হয়।

এবিএল মডেল হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নানা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম। এবিএল মডেল এমন এক ধরনের শিক্ষাক্রম, শিখন কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন, গতি, পছন্দ ও মানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা করা হয়। শিশু কখনও এককভাবে, কখনও জুটিতে আবার কখনও দলে কাজগুলো করে। একটি যোগ্যতা অর্জন করতে একজন শিক্ষার্থীর যতক্ষণ সময় প্রয়োজন হবে ততক্ষণ সময় তাকে দিতে হয়। কারণ, সব শিক্ষার্থীর শিখনের চাহিদা, আকাঙ্খা বা গতি সমান থাকে না।

প্রচলিত শ্রেণিকক্ষ থেকে Ability Based শিখন কার্যক্রম ভিন্ন, কারণ

এতে একই শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ও মানের শিক্ষার্থী থাকে এবং একসাথে শিক্ষন-শিখন কার্যক্রম (Multigrade Teaching-Learning) পরিচালনা করা হয়।

- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, পছন্দ ও শিখনের গতি অনুযায়ী শিখন পরিকল্পনা করা হয়।
- শিক্ষার্থীরা অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক দলে কাজ করে।
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজের শিখনের ধরন ও অবস্থান বুঝতে পারে।
- মূল্যায়নসমূহ বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে যেমন- স্ব-মূল্যায়ন, শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন, পিয়ার মূল্যায়ন ইত্যাদি।
- নানাবিধ কৌশল ও কর্ম তৎপরতার সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়ন দক্ষতা, বিচারমূলক চিন্তার দক্ষতা এবং বিশ্লেষণী দক্ষতার বিকাশে সহায়ক হয়।
- জীবন দক্ষতা ও জীবিকা নির্বাহ দক্ষতাকে পাঠ্যক্রমের একটি অপরিহার্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এবিএল মডেলে শিখনের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিদিন পঠন পাঠনের সময় মোট ৩ ঘণ্টা (১৮০ মিনিট)। ছয়টি বিষয়ের মধ্যে এই সময়টি কীভাবে বণ্টন করা হয়েছে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো :

- বাংলা : ৬০ মিনিট করে প্রতিদিন
- গণিত : ৪৫ মিনিট করে প্রতিদিন
- ইংরেজি : ৪৫ মিনিট করে প্রতিদিন
- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৩ দিন (১ম ও ৩য় সপ্তাহের প্রথম তিন দিন)
- প্রাথমিক বিজ্ঞান : ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৩ দিন (২য় ও ৪র্থ সপ্তাহের প্রথম তিন দিন)
- জীবনদক্ষতা : ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে দুই দিন (প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও বুধবার)
- ধর্ম ও নৈতিকতা এবং ছবি অংকন : ধর্ম ও নৈতিকতা ২০ মিনিট করে এবং ছবি অংকন ১০ মিনিট করে সপ্তাহে ১ দিন (প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার) ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিমানের শিক্ষার্থীদের জন্য।

এবিএল মডেল ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সরকারের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার নিজস্ব

প্রজেক্ট ওরিন্টেশনে অতিথি বরন

মডেল (Five Steps Principles of MGTLA Model) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা সফলভাবে প্রমাণ করে চলেছে। সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির জন্য স্বীকৃত বা নির্বাচিত মডেলগুলোর মধ্যে Five Steps Principles of MGTLA Model এবং ABL মডেল মূলত মাল্টিগ্রেড পদ্ধতিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেহেতু এবিএল মডেলও একটি মাল্টিগ্রেড পদ্ধতি আর মাল্টিগ্রেড পদ্ধতির বিষয়ে রয়েছে ডাম এডুকেশন সেক্টরের প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল এবং দাতা সংস্থা UNICEF এর সাথে রয়েছে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাই এবিএল মডেলেও কাজ করে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবিএল

মডেলে Let us Learn Project নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

লেট আস লার্ন প্রকল্পের অগ্রগতি

সরকারের সাথে একটি অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার মুলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ইউনিসেফ বিশ্বের পাঁচটি দেশে (বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, লাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার ও নেপাল) লেট আস লার্ন প্রকল্পটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন লেট আস লার্ন প্রকল্পটি সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও বিশম্ভরপুর উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি ১২ মার্চ, ২০১৯ হতে শুরু হয়েছে এবং ৩১, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের আওতায় ১০০টি প্রাথমিক শিশুশিখন কেন্দ্র ও ১৫০টি প্রাক-প্রাথমিক শিশুশিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে যথাক্রমে আগামী ২ বছরে ৫ থেকে ৬ বছরের ৯ হাজার জন শিশু ও ৮ থেকে ১৪ বছরের ৩ হাজার জন শিশু শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

১২ মার্চ ২০১৯ প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই ৩১ শে মার্চের মধ্যে প্রকল্পের ৪০ জন কর্মী (৮ জন নারী ও ৩২ জন পুরুষ) সুনামগঞ্জে যোগদান করলে দক্ষিণ সুনামগঞ্জে অবস্থিত এফআইভিডিবি এর সেন্ট্রাল ট্রেনিং সেন্টারে ১ থেকে ২ এপ্রিল আয়োজন করা হয় 'প্রজেক্ট অরিয়েন্টশন ফর অল স্টাফ এন্ড ইনডাকশন'। এ অরিয়েন্টশনে ফ্যাসিলিটেটর ও রিসোর্স পারসন হিসেবে যোগ দেন UNICEF ঢাকা এর এডুকেশন স্পেশালিষ্ট ইকবাল হোসেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেড অব এডুকেশন মো. সাহিদুল ইসলাম, ডাম এইচআর বিভাগের সহকারি পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান এবং সাতক্ষীরা থেকে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এর ফিরোজ রহমান। তার পরদিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল থেকেই শুরু হয় মূলত: লেট আস লার্ন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ।

নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ২ মে ২০১৯ এর মধ্যেই শিক্ষার্থী জরিপ, শিক্ষার্থী নির্বাচন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, শিক্ষক নির্বাচনসহ সকল প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে উপজেলা দু'টিতে মোট ১৫১টি কেন্দ্র ঘর (১০০ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১৫১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র) তৈরি বা সংস্কারের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। বছরের মাঝামাঝি সময়েও শতভাগ শিক্ষার্থীর মাঝে এনসিটিবি'র বই বিতরণের মাধ্যমে UNICEF ও স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রসমূহ একযোগে উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক শিশু শিখন কেন্দ্রসমূহে ১৪৩৭ জন মেয়ে শিশু এবং ১৫৬৩ জন ছেলে শিশু ভর্তি করা হয়। আর প্রাক-প্রথমিক শিশু শিখন কেন্দ্রসমূহে ভর্তি করা হয় ২৩৭৪ জন মেয়ে এবং ২১২৬ জন ছেলে শিশু। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির ১০৫৭ জন সদস্যদের (৫৩৮ মহিলা ও ৫১৯ পুরুষ) প্রশিক্ষণও ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহায়তায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা হতে বাছাই করে চার জন সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে লেট আস লার্ন প্রকল্পের সকল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের (১৫১ জন) ১৫ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং তারা একাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। আর এবিএল শিক্ষকদের (১০০ জন) ৯ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে UNICEF-র এবিএল মডেল নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষকগণ দ্বারা।

কর্মসূচি পরিদর্শন করে সরকারি ও ইউনিসেফ কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর আওতায় সকল কর্মী ও শিক্ষকবৃন্দকে এরই মধ্যে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ

ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, দুই উপজেলার জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সকল ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যানবৃন্দ, UNICEF সিলেট ফিল্ড অফিস ও UNICEF ঢাকা অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্মসূচি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সর্বোপরি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে **'লেট আস লার্ন প্রকল্পের'** লক্ষ্য বাস্তবায়নে এডুকেশন সেক্টরের কর্মীরা কাজ করে চলেছেন।

ধন্যবাদ।

সাইফুল করীম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, লেট আস লার্ন প্রকল্প-সুনামগঞ্জ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

মাসিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরদের একাংশ

ট্রেনিংকে 'হ্যাঁ' বলুন ট্রেনিংয়ে কাজ, কাজেই উন্নতি

মো. দেলোয়ার হোসেন

জীবন ও জীবিকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বাস্তবতার নিরীখে বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও মানোন্নয়নের বেশ কিছু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের সাধারণ বর্ণনা :

২০০৬ থেকে আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সেন্টারটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আওতায় যাত্রা শুরু করে। প্রথম থেকেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। উদ্দেশ্য- **কর্মহীন ও অবকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন**। এই রূপ একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে **আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর**। এই প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুরে দরিদ্র, হত দরিদ্র, অসহায় ,সুবিধা বঞ্চিত নারী ও পুরুষের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে। বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে চার টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে বর্তমানে Building Skills for Unemployed and Underemployed Labour (B-SkillFUL) প্রজেক্টের কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে ৫৬০ জন ছেলেমেয়ে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং ৮৫-৯০% প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে। যার ফলে তার নিজের এবং পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে Registered Training Organization (RTO) কার্যক্রম

প্রতিটি সেশনের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, পুরোনো প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে নতুন প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহ ইত্যাদি।

পরিচালনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন, আশা করা যায় খুব সহসাই এ কার্যক্রম শুরু হবে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে অনেক গ্র্যাজুয়েট আজ নিজে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেখানে অনেক বেকার নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, জিপিও, সেন্টার ম্যানেজার, চাকরিদাতা, নেটওয়ার্কিং পার্টনারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সূচকের আলোকে অলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও নথি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। B-SkillFUL Project ক) গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর খ) সোয়েটার নিটিং অপারেটর গ) সোয়েটার লিংকিং অপারেটর এবং ঘ) মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। ২০১৫ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অত্র প্রতিষ্ঠানে ২টি কোর্স পরিচালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পরিচালিত কোর্সগুলো হল :

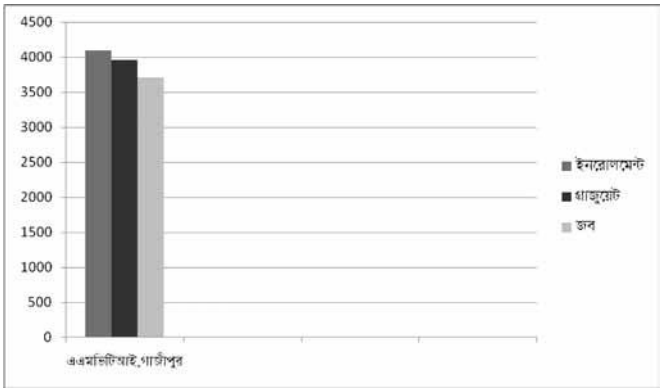

১. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন
২. সোয়েটার নিটিং অপারেশন
৩. সোয়েটার লিংকিং অপারেটর
৪. মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান

নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণসহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা :
প্রতিটি সেশনের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, পুরোনো প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে নতুন প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহ ইত্যাদি।

প্রকল্পের লক্ষ্য :
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা কর্মহীন ও অবকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এই প্রকল্পের লক্ষ্য । প্রকল্পের কর্মসূচি হলো :

(ক) পুরুষ ও মহিলা উভয়কে আয়বর্ধক কর্মসূচির আওতায় এনে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বিশেষ করে মহিলাদেরকে কর্মে নিয়জিত করে পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(খ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও প্রসারের মাধ্যমে মজুরি ভিত্তিক স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।
(গ) দরিদ্র জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক/কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ 'আরটিও' পরিদর্শন করছেন

অ্যাফিলিয়েশন লাভ করে। প্রশিক্ষণের গুনগত মান উন্নয়ন, সার্বজনিন মুল্যায়ন এবং দেশ স্বীকৃত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় এবং সরকারি সনদ প্রদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর বর্ণনা :
আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ BTEB কর্তৃপক্ষের

(ঘ) হতদরিদ্র, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গাজীপরে ২০০৬ হতে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ৪০৯৪ জন এনরোলমেন্ট হয়েছে, ৩৯৬৪ জন গ্রাজুয়েট হয়েছে, তার মধ্যে ৩৭০৭ জনের

রাজিনার জীবন কাহিনী

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের মেয়ে রাজিনা খাতুন। রাজিনার পিতা মো. আব্দুর রাজ্জাক একজন প্রান্তিক কৃষক। মাতা মোসা. সাকেরা বেগম একজন গৃহিণী। রাজিনার পিতা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে সংসারের খরচ চালাতেন। রাজিনা তার পরিবারের সাথে বালু গ্রাম-নয়াগোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বসবাস করত। চার ভাই বোনের মধ্যে রাজিনা সবার বড়।

৮/৯ বছর বয়সেই তার জীবনে নেমে আসে এক চরম দুর্ঘটনা। একদিন বিকাল বেলা বাড়ির পাশের রাস্তায় খেলার সময় গাড়ির ধাক্কায় তার ডানপায়ের পাতার অর্ধেক কেটে যায়। সেই থেকে সে প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী অবস্থায়ও সে তার লেখা পড়া চালিয়ে যেতে থাকে। পরিবারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তার পিতার পক্ষে সব ভাই বোনদের লেখা পড়ার খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। অষ্টম শ্রেণীর পর রাজিনার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজিনা আর লেখাপড়া করতে পারেনি।

তার চাচাতো বড় ভাইয়ের ব্যবসায়িক পরিচিতির মাধ্যমে একটি ছেলের সাথে তার পরিবারের পরিচয় হয়। তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি রাজিনাকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপর রাজিনার বিয়ে হয়ে যায় এবং রাজিনার স্বামী ও এখানেই বসবাস করতে থাকে। রাজিনা শ্বশুরবাড়িতে যেতে চাইলে তার স্বামী বিভিন্ন কথা বলে এড়িয়ে যেত। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিত না। পিতার পরিবারের আর্থিক সমস্যা আরও বেড়ে যায়। রাজিনার একটি ছেলে সন্তান হওয়ার পর সে জানতে পারে, তার স্বামীর পূর্বেই আর এক বউ ও তিন সন্তান আছে। তখন থেকেই তার স্বামীর সাথে মনোমালিন্য শুরু হয়। এক সময় তার স্বামী, সন্তানসহ রাজিনাকে ফেলে চলে যায়।

জীবিকার সন্ধানে রাজিনা গাজীপুরের টঙ্গীতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়। সে নিজের গ্রামে টুকটাক দর্জির কাজ শুরু করে। এতে রাজিনার সংসার তেমন চলত না।

ছেলে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার চাহিদা বাড়তে থাকে। রাজিনা জীবিকার তাগিদে চাচাতো ভাই এর সাথে আবার গাজীপুর আসে গার্মেন্টসে চাকরি করবে বলে। কিন্তু সেই আসার জন্য যে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা দরকার তার কাছে তাও ছিল না। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ১০০ টাকা সুদে ১০০০ টাকা নিয়ে আসে।

দেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মতো রাজিনারও অবদান আছে

সে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ঘুরে ঘুরে ও চাকুরী পায় না। কারণ একে সে অদক্ষ, তার উপর সে প্রতিবন্ধী। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা, আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। একদিন কথা প্রসঙ্গে এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারে যে **"আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট"(এএমভিটিআই)** গাজীপুরে বিভিন্ন ট্রেডের কাজে প্রশিক্ষণ দেয় এবং কোনো প্রকার টাকা পয়সা লাগে না, উপরোন্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

রাজিনা গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর ট্রেডে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। রাজিনাকে সেই সুযোগ এএমভিটিআই কর্তৃপক্ষ করে দেয়। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে রাজিনা খুব খুশি। তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে শিক্ষকরা তাকে বিশেষ যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সে "আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" থেকে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। রাজিনা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর এন্ড মেইন্টেন্যান্স ট্রেডে স্বল্প মেয়াদি দক্ষতা মান উন্নয়ন বেসিক ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে এএমভিটিআই-এর জব প্লেসমেন্ট কর্মকর্তার সহযোগিতায় সে "ল্যাভেন্ডার গার্মেন্টস লিমিটেড" গাজীপুরে চাকুরি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় রাজিনার ৭৬০০ টাকা বেতন ধরা হয়। মাস শেষে এখন সে ১০,০০০ থেকে ১৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পায় (ওভারটাইমসহ)।

এএমভিটিআইতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় রাজিনা যে বাসায় ভাড়া থাকত সেখানেই গৃহপরিচারিকার কাজ করে, ছেলে সন্তানকে নিয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করত। বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে টাকার জন্য হাত পাততে হতো।

এখন রাজিনার সুসময়। স্বামীর সাথে যে মনোমালিন্য ছিল সেটিরও সমাধান হয়েছে। তার জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজিনা এখন স্বাবলম্বী এবং তার পিতার পরিবারকেও অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে। এখন রাজিনার চোখে অনেক স্বপ্ন। ছেলেকে ভালো মাদ্রাসায় ভর্তি করাবে। দেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মতো রাজিনারও অবদান আছে।

সোয়েটার নিটিং অপারেটর ক্লাস

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেটর ক্লাস

জব হয়েছে।

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ তথ্য :

আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, গাজীপুর প্রশিক্ষণের মান বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষকদের প্রকল্প এবং প্রকল্পের বাইরে সুযোগ আসলে প্রশিক্ষণ কর্মসুচীতে অংশগ্রহণ করানো হয়। প্রতিটি ট্রেডের প্রশিক্ষকগণ NTVQF Level ধারী।

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুঃ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অত্র প্রতিষ্ঠানে ২টি কোর্স **"আর টি ও"** পরিচালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট **"আর টি ও"** অনুমতি প্রাপ্ত কোর্সগুলো হলঃ

১. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেটর
২. মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান

প্রতিষ্ঠানের ভালো চর্চা গুলো (Good practices) ঃ

আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ "টিভিইটি" বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বাইরে ও সামান্য মাত্র ফি নিয়ে প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করেছে। যখন কোন প্রজেক্ট থাকবে না তখন ভিটিআই নিজস্ব আয়ে চলতে পারবে।

আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে আগামী ১লা আগষ্ট ২০১৯ ইং থেকে ডিজিটাল (মালটিমিডিয়া) ক্লাস রুমের মাধ্যমে প্রতিটি ট্রেডে ক্লাস নেয়া হবে। ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটি এবং ইন্সট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

ভিটিআইয়ের সার্বিক পরিবেশ বিষয়ক তথ্যঃ

ভিটিআইতে বর্তমানে ১টি প্রজেক্ট চলমান Building Skills for Unemployed and Underemployed Labour (B-SkillFUL)। উক্ত প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ভিটিআই পরিচালিত হচ্ছে। একটি প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফান্ড স্বল্পতার কারণে ইচ্ছা থাকলে ও নতুন নতুন অনেক কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে টিইভিটি বিভাগের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। এছাড়া ভিটিআই এর সার্বিক পরিবেশ ভাল। স্টাফদের মধ্যে কাজের সমন্বয় রয়েছে। মাসিক স্টাফ মিটিং সময়মত অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে

জরিপ কার্যক্রম চলছে

মো. দেলোয়ার হোসেন, ম্যানেজার, আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

সাক্ষরতা একটি মানবীয় অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি

শিক্ষা সেক্টরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ উদযাপন

সাক্ষরতার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৬৬ সাল থেকে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে ইউনেস্কো। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারাবিশ্বের মানুষকে তারা বলতে চায়, সাক্ষরতা একটি মানবীয় অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বিগত এক দশকে সাক্ষরতার হার ২৮ দশমিক ১২ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ডেটা এটলাস বিভিন্ন দেশের সাক্ষরতার হার প্রকাশ করেছে।

"বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর শিক্ষা সেক্টর নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ পালন করে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ সফলভাবে পালন করার জন্য; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি স্টেকহোল্ডারদের যৌথ সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। দিবসটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত ও সচেতন করতে সরকারিভাবে রাজধানীসহ দেশের সব জেলা ও উপজেলায় বিএনএফই, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, এসএমসি সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষানবিশ, এনজিও প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকসহ বিশিষ্টজন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কর্মকর্তারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ঢাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এমপি এর উপস্থিত সকাল ৮টায় জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কর্মঅঞ্চল বিশেষ করে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ এবং কক্সবাজার এলাকায় UCLC, DiC-II, QIESD, DMIE, SFP,LET US LEARN এবং JOYFUL প্রকল্পের আয়োজনে এলাকাসমূহের প্রায় ৫১০০ শিক্ষার্থী, টিউটর, অভিভাবক, স্থানীয় বিভিন্ন কমিউনিটি কমিটির সদস্য, এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের

বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা

প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, র‍্যালি, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দিনটি উদযাপনের অংশ হিসেবে ঢাকায় মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (UCLC), এবং ড্রপ ইন সেন্টার (DiC-II) এর আয়োজনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সিএমসি কমিটির সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধিগসহ প্রায় ১,৭৮২ জন উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষে প্রত্যেক প্রকল্প র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির আয়োজন করে।

সুনামগঞ্জ জেলার দুটি উপজেলায় লেট আস লার্ন প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দ, নিকটস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়সহ শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ক বিভিন্ন স্লোগানে এলাকা মুখরিত করেন। এ দুটি উপজেলার র‍্যালির প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ডাম এর লেট আস লার্ন প্রকল্পের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অফিসের ১২০ জন শিক্ষকের একই ধরনের ও একই রংয়ের পোশাক পরে র‍্যালিতে

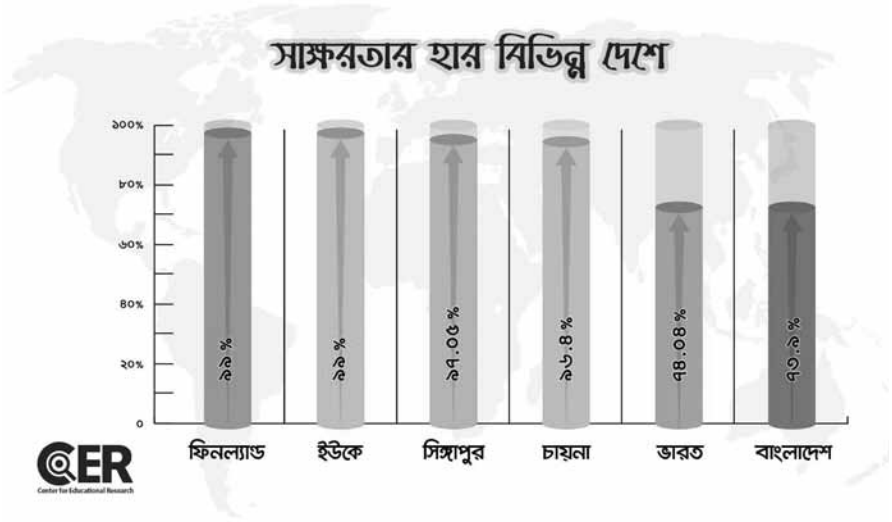

অংশগ্রহণ করা। যা উপজেলা প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্কুল ফিডিং (SFP) প্রকল্পের ময়মনসিংহ জেলার পাঁচটি উপজেলায় এবং বরিশালের চারটি উপজেলায় আয়োজিত র‍্যালিতে প্রায় ৩০৪২ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী প্রাথমিক কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে কিশোরগঞ্জের ইটনা ও মিঠামইন উপজেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি সহ প্রায় দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সিএমসি কমিটির সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তির অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জয়ফুল প্রকল্প।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন

নীলফামারীর জলঢাকায় কমিউনিটি কর্তৃক শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনার প্রতিবেদন

২০১৩ সালে ১৩টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র কমিউনিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়

শিশুর প্রাক-শৈশব উন্নয়নের লক্ষ্যে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০০১ সাল থেকে জলঢাকা উপজেলায় ৩-৫ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের জানুয়ারী মাস হতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানসম্মত প্রাথ মিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫২১ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে) পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু মাত্র এক বছরের পর প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর কৌশলগত পরিবর্তনের কারণে ২০০ এসবিকে বন্ধ করতে হয়। অর্থাৎ ২০১৩ সালে এসবিকে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২১ টি। এমতাবস্থায় কমিউনিটিতে একটি প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, এসবিকে প্রকল্প চলমান রাখার জন্য কিছু কমিউনিটির প্রতিনিধি লিখিভাবে আবেদন জানাতে থাকেন।

প্রস্তুতিমূলক কাজ

কমিউনিটির এ চাহিদা বিবেচনা করে আমরা SWOT analysis এর মাধ্যমে দেখলাম যে, আমাদের কমিউনিটির মাধ্যমে এসবিকে পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে, কারণ কমিউনিটিতে বর্তমানে ২০০ প্রশিক্ষিত সহায়িকা রয়েছে, কমিউনিটি কর্তৃক প্রদত্ত ঘর রয়েছেন, এছাড়া রয়েছে কমিউনিটির দক্ষতা। এই বিবেচনায় আমরা পরিক্ষামূলকভাবে ২০১৩ সালে ১৩টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র কমিউনিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু করি। SWOT analysis-এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, অন্যান্য বিষয়গুলো কমিউনিটি ম্যানেজ করতে পারলেও সহায়িকাদের রিফ্রেশার্স/ প্রশিক্ষণ এবং প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালের যোগান দিতে তারা অক্ষম। এ পরিস্থিতিতে আমরা কমিউনিটির সাথে সম্মত হই যে, কমিউনিটি শিশু, সহায়িকার সম্মানী, ঘর, স্থানীয় উপকরণ সরবরাহ, নিয়মিত দেখাশেনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে কমিউনিটি আর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রিফ্রেশার্স, প্রশিক্ষণ, প্রিন্টিং উপকরণ এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল

ইউপি সদস্য ভিজিএফ-এর চাল বিতরণ করেন

সাপোর্ট প্রদান করবে। এভাবে ২০১৩ সালে ১৩টি কমিউনিটি মাধ্যমে এসবিকে চলতে থাকে এবং আমরা একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

২০১৩ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান অবস্থা

যেহেতু আমাদের কমিউনিটিতে অদ্যাবধি অনেক প্রশিক্ষিত সহায়িকা আছেন এবং এলাকায় অনেক শিশু আছে এবং আমাদের বিগত বছরের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০১৪ সালে কমিউনিটি ম্যাধমে এসবিকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিষয়টিকে এজেন্ডা করে ইউপি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভায় আলোচনা করা হয়, সভার মাধ্যমে স্থানীয় দাতা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং ইউপিকে সহযোগিতার জন্য আহবান জানানো হয়। সহযোগিতার আহবানে উৎসাহজনক সাড়া মেলে। ২০১৪ সালে শিমুলবাড়ি ইউপি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে কমিউনিটি মবিলাইজেশনের মাধ্যমে একজন প্রবাসী দাতা সংগ্রহ করা হয়, এ প্রবাসী দাতা শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ১৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকার সম্মানী প্রদান করে আসছেন। ইউনিয়ন পরিষদগুলো এসবিকে সহায়িকাগণকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ভিজিএফ এবং ভিজিডি কার্ড প্রদান করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কমিউনিটি মবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এভাবে অভিভাবক, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, ইউপি, প্রবাসী, স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তি, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থানীয় কেজি বিদ্যালয়সহ সবার সার্বিক সহযোগিতা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কারিগরি সহযোগিতায় এখন সেই কমিউনিটি ম্যাধমে এসবিকে-র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫০। বর্তমানে ২১০টি প্রকল্প সহযোগিতায় পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পাশাপাশি ১৫০টি এসবিকে কমিউনিটির সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে (ইউপি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে ৫৬টি, কমিউনিটি ও অভিভাবক পরিচলনা করছে ৮৬টি, ব্যক্তি পরিচালনা করছে ৫টি, কেজি স্কুল পরিচালনা করছে ৩টি)।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

যেহেতু এই এলাকার মানুষ শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জন করেছেন, এলাকায় অনেক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়িকা রয়েছেন, তাই এলাকার শিশুরা এর সুফল পাচ্ছে। কাজেই স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং কমিউনিটি রিসোর্স মবিলাইজেশনের মাধ্যমে শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোকে চলমান রাখা সম্ভব। তবে সহায়িকাদের রিফ্রেসার্স, কারিগরি সহায়তা এবং এসবিকের প্রিন্টিং উপকরণ যোগান দেওয়া কমিউনিটির পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় এর একটি বিকল্প পন্থা থাকা প্রয়োজন, তবেই এই শুভ চর্চাটিকে নির্বিঘ্নে চলমান রাখা যাবে।

শ্রেষ্ঠ রিসোর্স পুল পুরস্কার

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে ডাম ডিএমআইই শিক্ষা প্রকল্প পুরস্কৃত

প্ল্যান ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশের একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ভালো অনুশীলনের স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি উদাহরণ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো তুলে ধরা হয়। শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর ১১টি ক্ষেত্র হলো- শ্রেষ্ঠ শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ এসএমসি, শ্রেষ্ঠ শিশু পরিষদ, শ্রেষ্ঠ রিসোর্স টিচার, শ্রেষ্ঠ প্রি-স্কুল শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ মেনটর, শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর এবং শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক। ডিএমআইই প্রকল্পের সহযোগিতায় নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী জলঢাকা উপজেলায় বিদ্যালয় পর্যায় হতে মনোয়ন সংগ্রহ করা হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসের অংশগ্রহণে নির্বাচক কমিটি ১১টি ক্ষেত্র হতে চূড়ান্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেন। ২০ মে ২০১৯ উপজেলা হল রুমে, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউএনও, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক মন্ডলী, সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১১টি ক্ষেত্রে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়, জাতীয় পর্যায়ে এই ১১টি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বাস্তবায়িত প্রকল্প বাস্তবায়নভুক্ত ৫টি জেলা হতে ১১টি ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক মনোয়ন সংগ্রহ করে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপজেলা পর্যায় থেকে ৫৫টি নমিনেশন জমা পড়ে। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে নির্বাচক কমিটি ১১টি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে।

ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৪ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ১১টি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৪টি ক্ষেত্রে যথা- শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ রিসোর্স টিচার, শ্রেষ্ঠ শিশু পরিষদ পুরস্কার অর্জন করে ডামের শিক্ষা কর্মসূচির জলঢাকা উপজেলার ডিএমআইই প্রকল্প।

এছাড়া ৫টি উপজেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করা ডিএমআইই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান এনসিটিবি, সহকারী পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ইউনিসেফ প্রতিনিধি, ৫টি উপজেলার শিক্ষা অফিসের কর্মী, শিক্ষক ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সকলেই তাদের এই শুদ্ধাচার অনুশীলনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সম্মানিত হওয়ায় অনুপ্রেরণা বোধ করছেন।

শ্রেষ্ঠ রিসোর্স টিচার্স পুরস্কার

শ্রেষ্ঠ অর্গানাইজেশন পুরস্কার

মিশনের কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা, কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে মিশনের সুনাম বৃদ্ধি, দাতা সংস্থার সমর্থন সৃষ্টি এবং দেশের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে মিশনের পরিচিতি তুলে ধরে ক্রমাগত উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিতকরণের বিভিন্নমুখী ভূমিকার জন্য কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন-জলঢাকা প্রকল্পের অর্জন খুবই প্রশংসনীয়।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন বক্তারা।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি’ বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্য দিয়ে নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণের লক্ষ্যে একটি নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এই কোর্সে যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানটি একটি ‘নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি’ প্রকাশ করেছে, যা গত ৬ জুলাই আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের নৈতিক শিক্ষা কোর্সে অংশ নেয়া সপ্তম একং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি বিতরণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলো। এই দিনলিপি বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে বলিয়ান হয়ে বেড়ে উঠতে অনুপ্রেরণা দেন। সিইই’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা তাঁর আলোচনায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে। এতে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবক তথা মা-বাবার বড় ভূমিকা রয়েছে। অভিভাবকরা যদি সন্তানের খোঁজ-খবর রাখেন তাহলে সন্তান সত্যিকারের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল শেখ সাঈদ আলী‘র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আয়োজনে আরো আলোচনা করেন অত্র কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মো. মফিজুর রহমান। নৈতিক শিক্ষা কোর্সের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা “সত্যের প্রচলনে

নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুশি

মিথ্যার পরাজয়, আলোর ফলে অন্ধকারের বিলিন হয়ে যাওয়া ও নৈতিকতার চর্চার ফলে অনৈতিকতার নির্বাসন” শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক আলোচনা পর্বের শুরুতেই এই আয়োজনের উদ্দেশ্য এবং সিইই’র কার্যক্রম বিষয়ে স্বল্পপরিসরে আলোচনা করেন সিইই’র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা। উপস্থিত অভিভবকদের মধ্য থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী লাবণ্য আক্তারে মা এমএসটি মারিয়ম এবং অপর এক শিক্ষার্থীর বাবা মো. শহিদুল ইসলাম নৈতিক শিক্ষা কোর্স বিষয়ে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। দিনলিপি বিতরণ আনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তাসমিনি রহমান। আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলোজি‘র প্রিন্সিপাল কাজী শহিদুল ইসলামসহ অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী মিলে প্রায় ২ শতাধিক মানুষ অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে অথিথিদের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিনলিপিটি বিতরণের মাধ্যমে আয়োজনের শেষ হয়।

“নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি” বিতরণ অব্যাহত

রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ২ শতাধিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি বিতরণ করা হয়।

নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি বিতরণ করছেন ডাম নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান বলেন, নৈতিক শিক্ষা আমাদের নিজেদের প্রস্তুতির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা আগামীতে আমাদের সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী সেনা হিসেবে কাজ করবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের লাখ লাখ তরুণ তরুণীকে চেঞ্জমেকার হতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

সিইই’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা বলেন, আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছো তোমাদের আগামীতে সকল প্রকার অনাচার বন্ধের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। প্রথমত নিজেকে সৎ ও মানবিক নৈতিকতা বোধে বলীয়ান হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মহিলা মিশনের কর্মকর্তা আবেদা সুলতানা, আহ্ছানিয় মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল শেখ সাঈদ আলী, অভিভাবক নীলা বেগম, মমতাজ বেগম এবং জেসমিন আক্তার। স্বাগত বক্তব্য দেন সিইই’র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশিদা খাতুন, মহিলা মিশনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীরা।

একই দিন দুপুর আড়াইটায় ঢাকার মাজার রোড সংলগ্ন হযরত শাহ্ আলী মডেল হাইস্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি বিতরণ করা হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে দিনলিপিটি তুলে দেয়া হয়। এ সময় স্বল্পপরিসরে আলোচনা করেন সিইই’র সিইও কাজী আলী রেজা, অত্র স্কুলে প্রধান শিক্ষক এম এ হামিদ, সিনিয়র শিক্ষক এ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং সিইই’র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক) এর যৌথ উদ্যোগে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) দেশের তরুণ সামাজের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে একটি নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করছে ২০১৮ সাল থেকে। কোর্সের অংশ হিসেবে নৈতিক শিক্ষা দিনলিপিটি প্রকাশ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নৈতিক শিক্ষা

একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম, সংস্কৃতির সাথে সেই দেশের নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেমন বড়দের দায়িত্ব; তেমনি এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা কি আমাদের সকল তরুণ প্রজন্ম তথা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের গৌরব কথা, সংগ্রাম বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের কথা যথাযথ মর্যাদার সাথে শেখানোর জন্য কাজ করছি? স্বাধীনতার এত বছর পরেও কি বাস্তবায়িত হয়েছে মুক্তি-সংগ্রামের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা? এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকে আমরা জানি। নৈতিকতার ভিত শক্ত না হলে সমাজের সকল স্তরে বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য। আজকে বাংলাদেশের সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত নৈতিক সমাজ গঠন। এই লক্ষ্যে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যৌথভাবে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বীরত্ব, স্বপ্ন ও ত্যাগের দিকগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার কাজ করছে। যাতে তারা পূর্ব-পুরুষের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আর একজন শ্রদ্ধাশীল মানুষ সব সময়ই নৈতিক মানুষ হবেন এটা আমাদের বিশ্বাস। নৈতিক শিক্ষা কোর্সের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অষ্টম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থী গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ও এই প্রজন্মের নৈতিক দায় বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেয়। তারা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় ও অংশগ্রহন করে। আলোচনার সূত্রপাত করেন সিইই'র সিইও কাজী আলী রেজা, লেখক, সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী এবং সিইই'র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রোগ্রাম অফিসার রনিকা ইসলাম। কলেজের শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে তাদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন। তারা একটি নৈতিক সমাজ গঠনে সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে নৈতিক শিক্ষা কোর্সের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬৫০ শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করবে।

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অষ্টম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থী গত ১৬ সেপ্টেম্বর জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ও এই প্রজন্মের নৈতিক দায় বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেয়

লেট আস লার্ন প্রকল্পের পিএমএস প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির লেট আস লার্ন প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন ও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং সিস্টেম' প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ সুনামগঞ্জের এফআইভিডিবির সেন্ট্রাল ট্রেনিং সেন্টারে ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ২দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর, ফিল্ড ম্যানেজার, টেকনিক্যাল অফিসার, সুপারভাইজরসহ ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ডাম সেন্ট্রাল মনিটরিং এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. আবুল হোসেন এবং লেট আস লার্ন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর তপন কুমার সরকার ও টিপু সুলতান ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের বৈশিষ্ট্য, ধারণা, গুরুত্ব, প্রচলিত ও অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের পার্থক্য, ডামের অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ গাইডলাইন পর্যালোচনা, পিএমএস কাঠামো, কমিউনিটি মনিটরিং ও ডেমো ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি, কমিউনিট মনিটরিং টুল্স ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন কৌশল, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, কমিউনিটি মনিটরিং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল ও শেয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপনা, ব্রেনস্টর্মিং, দলীয় কাজ, বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর নানা পদ্ধতি সকলের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণটি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে কমিউনিটি ও সিএমসি অংশগ্রহণে প্রকল্প কর্মীর সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ের মনিটরিং কাঠামো তৈরি হবে। মনিটরিং কার্যক্রম প্রকল্প কর্মী কমিউনিটি/সিএমসি সদস্য হাতে হস্তান্তর করবেন।

দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সকল অংশগ্রহণকারীগণ ৪টি দলে সরজমিনে ৪টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে অভিভাবক ও সিএমসি সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কমিউনিটি মনিটরিং কাঠামো প্রস্তুত করা হয়। কমিউনিটির এজেন্ডা অনুযায়ী মনিটরিং কাঠামো প্রস্তুত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের মনিটরিং চার্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ তাদের পর্যবেক্ষণ দিবেন।

সরজমিনে প্রস্তুত করা পিএমএস কাঠামো ট্রেনিং রুমে প্রতিটি দলের প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণের অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে সহায়ক আবুল হোসেন প্রথম দিনের প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "মাদকনির্ভরশীলদের পরিবারে সহনির্ভরশীলতার প্রভাব"

মাদকনির্ভরশীল সমস্যায় সহনির্ভরশীলতা এমন একটি সমস্যা যেখানে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির সাথে তার পরিবারের অসুস্থতা দেখা যায়। এজন্য মাদকনির্ভরশীল রোগকে বলা হয় পারিবারিক রোগ। উক্ত বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ৩১ জুলাই ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "মাদকনির্ভরশীলদের পরিবারে সহনির্ভরশীলতার প্রভাব"। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক নিলুফার ইয়াসমিন। পরবর্তীতে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান "মাদকনির্ভরশীলদের পরিবারে সহনির্ভরশীলতার প্রভাব" বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোচিকিৎসক ও এডিকশন প্রফেশনাল ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম এবং আইআরএসওপি প্রকল্প সমন্বয়কারী চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও এডিকশন প্রফেশনাল মো. আমির হোসেন। সভায় আলোচকগন বলেন সহনির্ভরশীলতা সমস্যার জন্য যদি পরিবারের কোনো সদস্যের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা নিতে হবে। আলোচকগণ আরো বলেন, মাদকনির্ভরশীল সমস্যা ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পরিবারের সদস্যদের সহনির্ভরশীলতা সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতায় সহায়তা করতে পারে। মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও নারী কেন্দ্রের স্টাফরা। সবশেষে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সকল অভিভাবককে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন কেন্দ্রের ফোকাল পার্সন উম্মে জান্নাত। সভাটি আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

তামাকের বিজ্ঞাপন ও বিক্রি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি

তামাকের বিজ্ঞাপন ও বিক্রি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং সিগারেটের খুচরা বিক্রি বন্ধ করা হবে বলে জানান প্রধান অতিথি বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি (বিডিএমএস) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্যোগে ২০ জুলাই বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি (বিডিএমএস), (সেঞ্চুরী আর্কেড, ৪র্থ তলা, ১২০, আউট সার্কুলার রোড, মগবাজার) কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা বন্ধে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ' প্রতিবেদন উপস্থাপন ও করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম তালুকদার। তিনি বলেন, স্কুল ও খেলার মাঠে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকপণ্য বিক্রি বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সরকারের ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. জহিরুল হক ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। ঢাকা মহানগর ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন মার্কেটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা বন্ধে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ' প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

প্রধান অতিথি বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বক্তব্য প্রদান করছেন

ব্যাগে সবজি চাষ, মুখে হাসি

ব্যাগে সবজি চাষের সাফল্য

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীরা খাবার, কাপড় এবং চিকিৎসার জন্য মানবিক সাহায্যের উপর নিভরশীল। এপ্রিল থেকে নভেম্বরে বর্ষাকালে তারা বন্যা এবং ভূমিধ্বসের কবলে পড়েন। নাজুক ঘরে থাকার কারণে তাদের অবস্থা হয়ে যায় খুব খারাপ। ক্যাম্পে বসবাসকারী এই রোহিঙ্গারা শাকসবজি পায়না। ডবলিউএফপি-র বিতরণ করা খাবারের মধ্যে চাল, তেল এবং ডাল থাকে। মাঝে মাঝে তারা রিলিফের খাবার বিক্রয় করে শাকসবজি কেনে। ক্যাম্পে শাকসবজির গাছ লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গাও নেই। প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে তারা বিভন্ন রোগের কবলে পড়ে। যেহেতু শাকসবজি পুষ্টির খুব ভালো উৎস, হেক্স/ইপারের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন উখিয়ায় শরনার্থীদের জন্য খাদ্য সুরক্ষা এবং জীবিকা কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় ব্যাগে গাছ চাষের (ব্যাগ-গার্ডেন) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

ব্যাগ-গার্ডেনের জন্য যাদেরকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন হলেন ফাতেমা (২৫)। পরিবারে এক ছেলে শিশু আছে, যার বয়স ছয়ের নিচে। নির্বাচিত আরেকজন হলেন মওসুদা(৫৩)। এই পরিবারের ৯ জন সদস্য রয়েছেন (পুরুষ ০৩, মহিলা ০৪)।সাধারণত শরণার্থীরা তাদের ঘরের চাল, চালের ছাদ এবং তাদের চালের পাশ দিয়ে ছোট পরিসরের সামনে সবজি চাষ করেন। তারা জানেন কীভাবে সবজি চাষ করা হয়, কিন্তু উন্নত সবজি বাগান সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকা আহছানিয়া মিশন পোর্টেবল ব্যাগে শাকসবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যা কমিউনিটি মোবিলাইজার দ্বারা পরিচালিত হয়। অধিবেশন চলাকালে তারা ব্যবহারিকভাবে দেখানো সহ সবজি উৎপাদনের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে সুবিধাভোগীদের মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও পালং শাক; এই তিন ধরনের সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। এই সময় সবজি চাষের জন্য রোপনের উপাদান সহ জিওব্যাগও বিতরণ করা হয়। জিওব্যাগ পাওয়ার পর তারা বীজ বপন করেন। তারা এই কার্যক্রমের জন্য খুব খুশি কারণ তারা পোর্টেবল ব্যাগ-গার্ডেনের মাধ্যমে টাটকা সবজি পাচ্ছেন যা তাদের পুষ্টি পূরণ এবং অর্থ সাশ্রয়ে সাহায্য করছে।

দুজনই জানান যে তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বাগান নিয়মিত দেখভাল করেন। তারা আশা করেন যে বাগান থেকে মৌসুমি শাকসবজি পাবেন যার মাধ্যেমে খাবার মেনুতে বৈচিত্র আসবে। এখন মাসিক রেশন থেকে পাওয়া খাবারে যে পুষ্টি-ঘাটতি ছিল, তা তারা পূরণ করতে পারছেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সামগ্রী বিতরণ

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ এবং ইউকে এইডের আর্থিক সহায়তায় মঙ্গলবার ৩০ জুলাই, ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "জামালপুর জেলার বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রকল্প"-এর আওতায় জেলার ইসলামপুর উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সামগ্রী ও নগদ ৪,৫০০ টাকা করে মোট ১ লাখ চারশত চুয়াল্লিশ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কর্মকর্তা এএসএম নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ মো. ফরিদুল হক খাঁন (দুলাল)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামপুর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আবদুন নাসের (বাবুল) এবং উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাথ শী ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মো. ইফতেখার আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম।

২০১৯ সালে ভারী বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে বয়ে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চালসহ বহুসংখ্যক জেলার মানুষ ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। জামালপুর জেলা তার মধ্যে অন্যতম। বিগত বছরের মতো এ বছরও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রাথমিক পর্যায়ে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর ও ঘোষেরপাড়া এবং ইসলামপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ও পথর্শী ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২৮৪টি পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা (মোট- ৫,৭৭৮,০০০ টাকা) ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সামগ্রী (স্যাভলন লিকুইড, ডিটারজেন্ট বার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, গোসলের সাবান, ঢাকনাযুক্ত প্লাষ্টিকের বালতি, প্লাস্টিকের মগ, প্লাস্টিকের জ্যারিকেন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওরাল স্যালাইন) বিতরণ করে।

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব
৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)
৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)
৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক
৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)
২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
৩। ব্যবসা বাণিজ্য
৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়
৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪১ ● সংখ্যা ৩ ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০